দারসে কুরআন সিরিজ-১৮

রাসুলুল্লাহর (স.) বিদায়ী ভাষণ

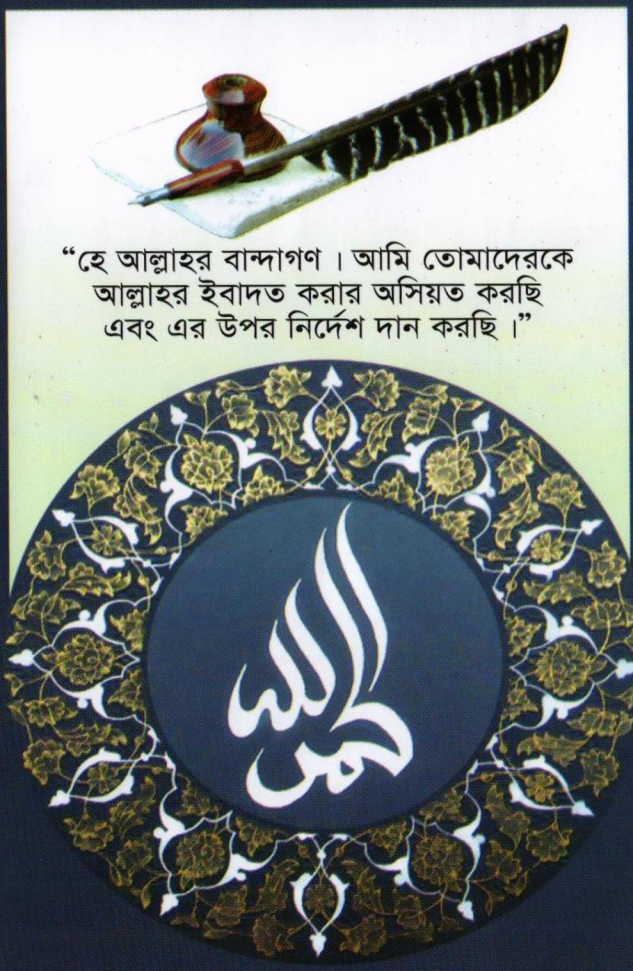

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ–১৮

রাসূলুল্লাহর (স) বিদায়ী ভাষণ

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর (স) বিদায়ী ভাষণ

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮৭ ইং
২৭তম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১৬ ইং

প্রচ্ছদ ঃ আনোয়ার হোসেন খান

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ ঃ মাদার প্রিন্টার্স
১৯ প্রতাপদাস লেন
শিংটোলা, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা আন নাসর ও বঙ্গানুবাদ	৫
একটি চিন্তার বিষয়	১০
কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন	১১
বিদায় হজ্জের ভাষণ	২২

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাঁদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- যারা আরবী ভাষা জানেন না অথচ কুরআন বুঝতে চান।
- যারা তাফসীর মাহফিলে শরীক হবার সুযোগ পান না।
- যারা খতীব মুবাল্লিগ–যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- সরল অনুবাদ ও শব্দের অর্থ।
- সহজবোধ্য ভাষায় অকল্পনীয় ও অকাট্যযুক্তি।
- নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার করা।
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আর একবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর (স) বিদায়ী ভাষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع النَّصْر - ١-٣

অনুবাদ ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং চূড়ান্ত বিজয় লাভ হবে আর (হে নবী) তুমি দেখতে পাবে যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি তোমার প্রভুর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি বড় তওবা গ্রহণকারী।

শব্দার্থ ঃ اِذَا– যখন। جَاءَ– আসবে। نَصْرُ – সাহায্য। نَصْرُ اللّٰهِ - আল্লাহর সাহায্য। وَ– এবং। اَلْفَتْحُ– বিজয়। (এখানে বিজয় অর্থ চূড়ান্ত বিজয়।) رَاَيْتَ– তুমি দেখতে পাবে। اَلنَّاسَ– মানুষ। يَدْخُلُوْنَ– প্রবেশ করবে। فِىْ– মধ্যে। دِيْنِ اللّٰهِ– আল্লাহর দ্বীনে। اَفْوَاجًا– দলে দলে। فَ– তাহলে বা তখন। سَبِّحْ– তসবীহ কর। بِ– সহকারে। حَمْدِ – প্রশংসা। رَبِّكَ – তোমার প্রভুর। وَاسْتَغْفِرْهُ – এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। اِنَّهٗ– নিশ্চয়ই তিনি। اِنَّ– নিশ্চয়। هٗ– তিনি। كَانَ– ছিলেন বা রয়েছেন। ইংরেজীতে যেমন am ও is এর অর্থ বাংলা অনুবাদে আসে না, ঠিক তেমনই আরবী كَانَ– শব্দের অর্থ বাংলা

www.pathagar.com

অনুবাদের মধ্যে পৃথক কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় না। তবে আরবীতে كَانَ– না লিখলে বাক্য শুদ্ধ হবে না। যেমন — ইংরেজীতে is বাদ দিয়ে শুধু He good boy বললে বাক্য শুদ্ধ হয় না। تَوَّابًا–তওবা গ্রহণকারী।

নাযিল হওয়ার সময় কাল ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন এটা আল-কুরআনের শেষ সূরা। এর পর আর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি তবে এর পরে অন্য কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন এ সূরাটি বিদায় হজ্জ কালে আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় মিনাতে নাযিল হয়।

এই সূরা নাযিল হওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উষ্ট্রির উপর সওয়ার হয়ে সে বৎসরের হজ্জের প্রায় সোয়া লাখ হাজীদের একত্রিত করে তাদের মাঝে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন যা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে খ্যাত। হযরত সাররা বিনতে নাবাহান বলেন আমি বিদায় হজ্জের সময় নবী করিম (স) কে এই কথা বলতে শুনেছি— হে লোক সকল! তোমরা কি জান আজ কোন দিন? লোকেরা বলল, আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি জান এটা কোন স্থান ? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। ইহা মাশয়ারে হারাম। আমি জানি না আগামী বছর তোমাদের সাথে আমার এখানে মিলিত হওয়া জুটবে কিনা। সম্ভবতঃ আর তোমাদের সাথে এখানে মিলিত হতে পারব না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যখন এই সূরাটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে এই সূরার মাধ্যমে। আমার হায়াত শেষ হয়ে আসছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন যখন এই সূরা নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন এই বছর আমার মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) কাঁদতে লাগলেন, রাসূল (স) তাঁর কান্না দেখে বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সর্ব প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এই কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন হযরত উমার (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্কদের নিয়ে মাঝে মাঝে বৈঠক করতেন। সেখানে আমাকেও ডাকতেন (হযরত ইবনে আব্বাস তখন কম বয়সের ছিলেন) কম বয়সের লোক হিসাবে আমাকে ডাকায় অন্যান্য বয়স্ক লোকগণ হযরত উমার (রা) কে বলতেন, আমাদেরও ছেলেরা আছে তাদের তো ডাকা হয় না, তারা তো এই ছেলেরই (হযরত ইবনে আব্বাসের) মত। অথচ এই ছেলেকে আমাদের বয়স্কদের মধ্যে ডেকে এনে বসান হয় কেন ? এর জবাবে উমার (রা) বলেন তাঁর ইলমি যোগ্যতা তো আপনারা জানেন এ কারণেই তাকে বয়স্কদের মিটিংয়ে ডেকে থাকি। একদিন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বয়স্কদের এক মাহফিলে হযরত উমার (রা) বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞেস করলেন আপনারা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরা সম্পর্কে কি বলতে চান অর্থাৎ এ সূরা থেকে কি বুঝেন। কেউ তার জবাবে বললেন যখন আল্লাহর মদদ আসবে এবং আমাদের বিজয় হবে তখন আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তার তসবীহ করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাইতে হবে। এরপর অপর একজন বললেন এর অর্থ শহর, নগর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অন্যেরা চুপ রইলেন। অতঃপর কম বয়সের সেই ছেলেটা (হযরত ইবনে আববাস (রা)) কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই সূরা থেকে কি বুঝ? তিনি জবাব দিলেন– না আমি তা বুঝতেছিনা। আমি অন্যকিছু বুঝতেছি। আমি বুঝতেছি যে, এই সূরায় নবী করিম (সা) এর মৃত্যু সংবাদ এসে গেছে। তিনি হযরত উমার (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি বুঝতেছেন, তিনি বললেন আমিও তার চাইতে বেশী কিছু বুঝতেছিনা। এই সূরায় নবী করিম (স) কে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে আপনাকে যে মূল দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে সে দায়িত্ব যখন পালন হয়ে যাবে, ইসলাম যখন দেশে সামগ্রিকভাবে কায়েম হয়ে যাবে, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার মত লোক থাকবে না, মানুষ যখন দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন মনে করবে যে রাসূল হিসাবে দায়িত্ব চালন সমাপ্ত হয়ে গেছে কাজেই এখন দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আর কোন কাজ নেই। অতএব তখন তুমি আল্লাহর প্রসংসা সহকারে এই জন্যে তসবীহ করতে থাক যে– আল্লাহ, তোমারই মেহেরবানীতে এবং তোমারই সাহায্যে এই জয়লাভ হতে পেরেছে আর তাঁর নিকট এই জন্যে ক্ষমা চাও যে–

www.pathagar.com

আল্লাহ, তোমার যমীনে তোমার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে কায়েম করতে গিয়ে কোথাও যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গিয়ে থাকে তাহ'লে মেহেরবাণী করে তুমি মা'ফ করে দিও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর বুদ্ধিমত্তা দেখে সবাই চমৎকৃত হলেন। হজরত উমার (রা) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, এখন আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন কেন আমি তাকে ডেকে এনে সঙ্গে বসাই।

এখানে লক্ষণীয় যে অন্যান্য কোন বীর পুরুষ যদি এ ধরণের কোন সংগ্রামে সামগ্রিক ভাবে জয়লাভ করেন তবে কত শান শওকাতের সাথে বিজয় উল্লাস উদযাপন করে থাকেন। তার গলায় ফুলের মালা দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাঁর কিছুই করলেন না বরং তিনি আল্লাহর নিকট বিনয়-নম্রতা সহকারে তাঁর শুকরিয়া আদায় করলেন। আর এই বলে ক্ষমা চাইলেন – হে আল্লাহ, তোমার দ্বীনকে তোমার যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দীর্ঘ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগীতে যদি কখনও কোন ভুলত্রুটি করে ফেলে থাকি তা'হলে তুমি আমাকে মা'ফ করে দাও।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তেকালের পূর্বে এই দোয়া বেশী বেশী করে পড়তেন।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অপর একটি বর্ণনা অনুযায়ী দোয়াটা নিম্নরূপ।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

কেউ কেউ এভাবেও পড়েন –

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ এর প্রত্যেকটি দোয়াই সমার্থবোধক। সূরা নসরে আল্লাহর হুকুম হল سَبِّحْ তসবীহ কর, তার জন্যে রাসূল (সা) বললেন سُبْحَانَ اللّٰهِ। অর্থাৎ سَبِّحْ শব্দের মাধ্যমে যে হুকুম হল সেই হুকুম পালন করলেন

www.pathagar.com

سُبْحَانَ اللّٰهِ শব্দ দ্বারা। অতঃপর হুকুম হল بِحَمْدِ رَبِّكَ অর্থাৎ তসবীহ পড় তোমার রবের প্রশংসা সহকারে। তাই রাসূল (স) বললেন بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর হামদ বা প্রশংসা সহকারে। আল্লাহর পুনঃ হুকুম হল وَاسْتَغْفِرْهُ এবং তার নিকট ক্ষমা চাও। তাই আল্লাহর রাসূল (সা) এই হুকুম পালন করলেন اَسْتَغْفِرُكَ 'আমি আপনার নিকট মা'ফ চাচ্ছি' এই কথা বলে।

একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দিক (রা) জিজ্ঞসে করলেন ঃ আপনাকে তো এতদিন এই ধরনের দোয়া পড়তে দেখিনি এখন আপনি এ কি দোয়া পড়া শুরু করেছেন? তিনি জবাবে বললেন "আল্লাহ আমাকে একটা নিদর্শনের কথা বলেছেন। বলেছেন – যখন তুমি দেখবে যে মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়ে যাচ্ছে আর ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার কোন লোক নেই তোমার সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় এসে গেছে তখন অর্থাৎ এই সব নিদর্শন যখন তুমি দেখবে তখন তুমি এই ভাবে দোয়া পড়বে। তাই আমি যখন দেখছি যে আল্লাহর সাহায্যে চূড়ান্ত বিজয় এসে গেছে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে ঢুকে পড়ছে তখনই আমি সে দোয়া পড়ছি। আর সে নিদর্শন হল সূরা নসর اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ।

অনুরূপ ভাবে আরও কয়েকটি বর্ণনা আছে, তাতে বলা হয়েছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন নবী করিম (সা) রুকু সিজদায় খুব বেশী বেশী এই দোয়া পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেছেন সূরা নসর নাযিল হওয়ার পর রাসূল (স) প্রায় সব সময় অর্থাৎ চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বদাই পড়তেন–

www.pathagar.com

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

তিনি বলেছেন আমি একদিন হুজুর (স)কে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি প্রায় সময়েই এই দোয়া কেন পড়েন ? তিনি জবাবে বলেছেন এটা পড়তে আমাকে হুকুম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি সূরা নসর তাকে পড়ে শুনালেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন সূরা নসর নাযিল হওয়ার পর হুজুর (স) এই দোয়া বেশী বেশী পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ـ سُبْحَانَكَ
رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ ـ

এর প্রত্যেকটি দোয়া একই ধরনের অর্থবোধক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন এই সূরা নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি পরকালের চিন্তায় বেশী বেশী নিমগ্ন হন এবং দোয়া কালামের উপর বেশী বেশী মেহনত করতে থাকেন।

একটি চিন্তার বিষয়

হুজুরে পাক (স) এক টানা ২৩ বৎসর বিরামহীন সংগ্রামের পর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় এসে যাওয়ার পর যখন তসবীহ পড়তে শুরু করেছেন যা দেখে তাঁর জীবন সঙ্গিনী পর্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনাকে তো এতদিন এরূপ করতে দেখিনি। প্রশ্ন, তা'হলে কি করতে দেখেছেন ? দেখেছেন অধিকাংশ সময় সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে। তাই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে তারা তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে এরূপ হঠাৎ পরিবর্তন কেন হল ? তিনি তার জবাবে বলেছেন আমার দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে এখন আল্লাহ আমাকে অবসর দিয়েছেন আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হওয়ার পরই বলেছেন তসবীহ পড়তে, তাই তসবীহ পড়া শুরু করে দিয়েছি।

www.pathagar.com

কিন্তু এ তসবীহ আমরাও পড়ি, পড়ি ঠিক রাসূল (স) এর কায়দায় অর্থাৎ তিনি দুনিয়ার সব চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে যেমন তসবীহ পড়তে মগ্ন হয়েছিলেন, আমরাও তেমন দুনিয়ার সব চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে তসবীহ নিয়ে মসজিদের কোণে বসে যাই । আমাদের এরূপ তসবীহ পড়া খোদ আল্লাহর রাসূল যদি জীবিত হয়ে এসে দেখতেন তা'হলে অবশ্যই খুশী হতেন এই চিন্তা করে যে আমার এ সব প্রাণপ্রিয় উম্মাত জান জীবন দিয়ে জিহাদ করে এ দেশে দ্বীন ইসলাম কায়েম করে ফেলেছেন, এ দেশে اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এর পর্যায় এসে গেছে, এখন এ দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলার কোন লোক নেই, আল্লাহর সাহায্যে চূড়ান্ত বিজয় লাভ হয়ে গেছে, ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস হয়ে গেছে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা খেলাফত ঘোষণা হয়ে গেছে। এখন এ দেশের ঈমানদার লোক সব দুনিয়ার দায়িত্ব শেষ করে অবসর জীবন যাপন করছেন। এখন এরা সব পরকালের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। আমার মনে হয় হুজুরে পাক (স) যদি স্বচক্ষে আমাদের এ মোখলেসানা তসবীহ পড়া দেখতেন তা'হলে অবশ্যই এরূপ মনে করতেন।

আফসোস যে আমরা রাসূল (স) এর জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা করিনি। চেষ্টা করেছি মাঝে মাঝে কিছু বাদ দিয়ে কিছু অংশকে বুঝতে। যা চেষ্টা করেছি তাই বুঝেছি।

কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন

১। এই সূরা পড়ে শুনানোর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) এর চোখ পানিতে ভরে উঠল, রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কাঁদছ কেন ? তিনি জবাব দিলেন এই সূরার মধ্যে আপনার মহাপ্রস্থানের সংবাদ রয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তিনি এ সূরার কোন শব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন?

অন্যান্য সাহাবীগণই বা এর মধ্যে কোন শব্দ থেকে হুজুর (স) এর মৃত্যু সংবাদ পেলেন?

২। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক লোকও তো যা বুঝতে পারেননি তা কি করে কম বয়সের হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বুঝলেন ? বুঝার সূত্রটা কি ছিল? সবার বুঝশক্তি কি এক প্রকার ?

www.pathagar.com

৩। হুজুর (স) আরব দেশে ইসলাম এনেছিলেন বিপ্লবের মাধ্যমে। যার ফলে মক্কা বিজয়ের পরে দেশের সমস্ত আইন কানূনের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। জাহেলী যুগের কোন আইন কানুনই সেখানে ছিল না। রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন কানুন শাসন পদ্ধতি সবই হল কুরআন ভিত্তিক অর্থাৎ যা আছে কুরআনে তাই ছিল দেশের সর্বত্র। কিন্তু সেই ইসলামই যখন এ দেশে আসল তখন তা কি কোন বিপ্লবের মাধ্যমে এসেছিল এবং ইসলাম এ দেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কি এ দেশের আইন কানুনের মধ্যে কোন আমূল পরিবর্তন ঘটতে পেরেছিল? তা যদি না পেরে থাকে তাহ'লে কেন পারলনা? বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় রয়েছি এ অবস্থার কোন পরিবর্তন আনার চেষ্টা আমাদের করা লাগবে? না কি জন্মের পর থেকে ইসলামকে যে অবস্থায় পেয়েছি সেই অবস্থায় রেখেই আমরা রাজীখুশী থাকব? অর্থাৎ আমরা জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি— সমাজে নামায আছে, রোযায় কেউ কোন বাধার সৃষ্টি করে না, ঈদের নামাজ পড়া যায়, গরু কুরবানী করতেও কোন বাধা নেই, ওয়াজ নসিহত আছে, মাদ্রাসা মসজিদ আছে, দাড়ি টুপি আছে, ঈদগাহ গোরস্থান আছে, বিবাহশাদীতে ইসলামী নিয়ম কানুন মানা হয়, মানুষ মরে গেলে ইসলামী কায়দায় জানাযা দেয়া যায়–এর কোনটাতেই যখন কোন বাধা নেই তখন আমরা ধরেই নিতে পারি যে এ দেশে ইসলাম পূর্ব হতেই কায়েম আছে। কাজেই এখানে সংগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমাদের সামাজে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এর পর্যায় তো পূর্ব থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে। কাজেই আমরা দায়িত্ব মুক্ত। আমরা এখন তসবীহ নিয়ে বসে যাব। এই ধারনাই কি ঠিক ?

৪। ১৪ শত বছর পূর্বে মক্কা বিজয়ের পর আরবের লোক ইসলামকে যে ভাবে পেয়েছিলেন, আমরাও কি ইসলামকে সেই ভাবেই পেয়েছি ?

এর উপর যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তাহ'লে এর প্রত্যেকটির জবাব আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়বে। এসব বুঝতে কোন উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় শুধু মনটাকে দিয়ে নিরপেক্ষ চিন্তা ভাবনা করার।

উত্তর ঃ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে ক'টা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি তার উপর কিছু আলোচনা করতে চাই, আশা করি সম্মানিত পাঠক পাঠিকাবৃন্দ চিন্তা করবেন এবং বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করবেন।

www.pathagar.com

১নং প্রশ্নের জবাব ঃ

কি করে কিছু সাহাবী বুঝলেন যে সূরা নসরে হুজুরে পাক (স) এর মৃত্যুর সংবাদ এসে গেছে। এটা বুঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

মনে করুন, আপনি কোন একটা নির্দিষ্ট কাজ করানোর জন্য কয়েকজন মজুর নিয়োগ করলেন। চুক্তি হল, এই কাজটা সমাধা হয়ে গেলে তোমাদের চাকুরী শেষ হবে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকা খাওয়া এখানে চলবে। আর যখনই কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন কাজের যন্ত্রপাতি যা দেয়া হল তা জমা দিয়ে বেতনটা নিয়ে নেবে। অতঃপর কাজ শেষ হয়ে গেলে, মালিক সেখানে খোদ উপস্থিত হয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কাজটা খুব সুন্দরভাবে সমাধা করেছেন। এ জন্যে আমি খুবই খুশী হয়েছি। এখন আপনাদেরকে দেয়া যন্ত্রপাতিগুলি আমার নিকট জমা দিয়ে আপনাদের পাওনাটা বুঝে নিন। অতঃপর তারা মালিকের যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিয়ে বেতনটা নিয়ে নিল। এর পর কি তাদের বলতে হয় যে, এর পর থেকে তোমাদের এখানে থাকা খাওয়া চলবে না এবং তাদের কেউকি এ কথা বুঝে যে এখানে আমার থাকা এরপরও চলবে ? তা কেউই বুঝেনা।

ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ অনেক পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে আমি তোমাকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হলো لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ যেন অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার উপর দ্বীন ইসলামকে গালেব বা জয়ী করে দেন। এটাই যদি হয় রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য তাহলে আল্লাহ যখন বললেন তোমাকে যে কাজের জন্যে পাঠানো হয়েছে অর্থাৎ অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা ও অন্যান্য ধর্মীয় মতবিশ্বাসের উপর দ্বীন ইসলামকে জয়ী করে দেয়ার জন্যে যে তোমাকে পাঠানো হয়েছে যখন তুমি দেখবে যে সেই নির্দিষ্ট কাজ আল্লাহর সাহায্যে সমাপ্ত হয়ে গেছে তখন তুমি তসবীহ পড়। এর অর্থ কি বুঝা যাবে? বুঝতে হবে এই— তোমাকে যে কাজে পাঠানো হয়েছে তা যখন সমাধা হয়ে গেছে তখন তোমার বাঁচার দরকারটা কি ? তখন তুমি তসবীহ পড়। এর থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় রাসূলের দায়িত্ব পালন যখন সমাধা হয়ে গেছে তখন তাঁর আর এই পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন নেই এই কথাই বলা হচ্ছে। এই বুঝটা যেমন রাসূল (স) এর মধ্যে সঠিক ছিল তেমনই ছিল সেই সব সাহাবী (রা) দের বুঝ যারা স্পষ্টভাবে বুঝতেন যে রাসূল

www.pathagar.com

প্রেরণের মূল কারণটা কি ছিল। এই মূল কারণ যারাই জানতেন তারাই এ সূরার কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেছে, ইসলামও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম হয়েছে তখন আর বাঁচার প্রয়োজন নেই– এই কথাই আল্লাহ বুঝাচ্ছেন।

এই কারণেই তো রাসূল (স) এ সূরা নাযিল হওয়ার পর সঠিকভাবে বুঝেসুঝেই সব হাজীদের ডেকে একত্র করলেন এবং বললেন আমার শেষ কথা শুনে যাও। এর পর এই ময়দানে আর তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

২নং প্রশ্নের জবাব ঃ

বদর যুদ্ধ প্রত্যাগতদের মধ্যে কিছু বয়স্ক লোকও তো বুঝতে পারেননি অথচ একটা বালক বুঝে ফেললেন – এটা কেমন ব্যাপার? এর জবাব হচ্ছে এই যে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তারা সবাই এক মেধার হতে হবে এটা জরুরী নয়। জরুরী হচ্ছে যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও গায়ে শক্তি থাকা। এর জন্য দূরদর্শী হওয়া সাধারণ সৈনিকদের জন্যে আবশ্যকীয় নয়। দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন তাদের যারা মূল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ কারণেই সাধারণ সৈনিক যারা ছিলেন তারা সবাই বুঝতে না পারলেও হযরত আববাস (রা) যেহেতু শিক্ষিত ও মেধাবী ছিলেন তাই তাঁর মাথায় সহজেই ধরা পড়ল ঠিক তদ্রূপই হুজুর (স) এর মূল মিশন যে কি ছিল তা কি আমাদের সবার মাথায় একই ভাবে ধরা পড়েছে ? তা পড়তে পারে না। এই জন্যেই দেখা যায় সমাজে দুই ধরনের মোখলেস লোক রয়েছেন। যার এক ধরন হল ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনে করেন। তারা মনে করেন রাসূল (স) এর ন্যায় সংগ্রাম করেই এ দেশে ইসলাম কায়েম করতে হবে। আর এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, ইসলাম একটা শান্তির ধর্ম, এর মধ্যে আবার আন্দোলন কেন?

তবে তাদের এখলাসের মধ্যে কোন ঘাটতি নেই; ঘাটতি শুধু চিন্তা ভাবনা ও বুঝের মধ্যে। এটাও দেখা গেছে যখন তাদের চিন্তায় মূল কথা ধরা পড়ে যায় তখনই তারা মত পরিবর্তন করে আন্দোলনে শরীক হয়ে যান।

৩নং প্রশ্নের জবাব ঃ

এ দেশে যদি বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটতো তাহলে তো বিজয়ের প্রথম দিনেই ঘোষণা হয়ে যেত আজ থেকে এটা ইসলামী আইনের

www.pathagar.com

দেশ, এ দেশে পূর্বের সমস্ত আইন কানুন বাতিল করে দেয়া হল। এখন হতে কুরআনী বিধান মুতাবিক রাষ্ট্র চলবে। কোন অশ্লীল কাজ বেহায়াপনা আজ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হল। এখন থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে। ডাকাতি করলে এক হাত ও এক পা কাটা যাবে। খুনের বদলে খুনের শাস্তি দেয়া হবে। মদ্যপান, মদতৈরী, মদ আমদানী ও রপ্তানি সব কিছুই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এখন থেকে বেপরদা চলতে পারবে না। এখন থেকে যে কোন প্রকার ইসলাম বিরোধী কাজ চলতে পারবে না।

কিন্তু যেহেতু বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশে ইসলাম আসেনি ত'ই বিশ্বাস পরিবর্তন করে মুসলমান হয়েছি ঠিকই কিন্তু কাজ কাম আইন কানুন পরিবর্তন করে এখনও পুরাপুরি আল্লাহর বান্দা বা আল্লাহর পুরা অনুগত হতে পারিনি। বরং যদিও আজ থেকে হাজার বছরেরও পূর্বে এ দেশে ইসলাম এসেছে কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে না আসার কারণে পুরা হাজার বছরের মধ্যেও আমাদের সমাজ থেকে বিজাতীয় ভাবধারা ধুয়ে মুছে যায়নি। যেমন– আমাদের বাংলাদেশে এখনও (১) কারও সন্তান হলে ৬ দিনের দিন ষষ্টি পালন করা হয়। সেদিন সারারাত ঘরে আলো জ্বেলে রাখা হয়। সন্তানকে কোলে করে সারারাত বসে থাকা লাগে। ছেলের মাথার দিকে ধান, টাকা, কাগজ, কলম ইত্যাদি রাখা হয়। এটা হিন্দুয়ানী প্রথা। হিন্দুদের বিশ্বাস ঐ রাতে ভাগ্যলিপি লেখা হয়। নির্ধারিত এক দেবতা আসেন। তিনি যদি ধান, টাকা পয়সা, কাগজ কলম ইত্যাদি সামনে দেখেন তাহ'লে ঐ সন্তানের ভাগ্যে তা লিখে দিয়ে যান। আর যদি কিছু না দেখেন তাহ'লে যা খুশী তা লিখে দিয়ে যেতে পারেন।

(২) আমাদের সমাজে স্বামী ও ভাশুরের নাম মেয়েরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না। এটাও হিন্দুধর্মমত থেকে সৃষ্ট। তাদের বিশ্বাস স্বামী ও ভাশুর দেবতা সমতুল্য। কাজেই তাদের নাম উচ্চারণ করলে দেবতা বেজার হবে। দেখা যায় আমাদের সমাজের শিক্ষিতা মেয়েদেরও মুখে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে গেলে সংকোচ বোধ হয়। কিন্তু এটা কেউ চিন্তা করি না যে উম্মাহাতুল মুমিনিন অর্থাৎ রাসূল (স) এর যাঁরা স্ত্রী ছিলেন তাঁরা কালেমা পড়তেন "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। এতে কি স্বামীর নাম উচ্চারণ হত না? এছাড়া রাসূলের নাম যেখানে উচ্চারণ করা যায় সেখানে তার চাইতে দামী লোক আর কে আছে যার নাম উচ্চারণ করা যাবে না ? এসব চিন্তা এখনও আমাদের অনেকেরই মাথায় ঢুকে না।

www.pathagar.com

(৩) এখনও পাড়াগাঁয়ে বুধবারে গোলা থেকে ধান বের করে না।

(৪) অনেক জায়গা আছে যেখানে রবিবারে বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটে না।

এমন বহু প্রথা আমাদের সমাজে রয়েছে যা সবই হিন্দু ধর্মমত থেকে সৃষ্ট। যা হাজার বছর পরেও সমাজ থেকে দূর হয়নি। কিন্তু যদি বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশে ইসলাম আসত তাহলে যেদিনই ইসলামের বিজয় হত সেইদিন থেকেই এ সমস্ত প্রথা বাতিল হয়ে যেত, সমস্ত আইন কানুন প্রথম দিন থেকেই কুরআন হাদীস মুতাবিক হত। যেমন হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর থেকে। তেমন প্রথম দিন থেকেই চুরি করলে হাত কাটা আইন, ডাকাতি করলে একদিকের হাত অপর দিকের পা কাটা আইন, যেনা করলে দোর্‌রা মারা ও মদ্য পানের শাস্তির আইন যা ইসলাম নির্দ্ধারিত করে দিয়েছে তার সব কিছুই বহাল হয়ে যেত।

৪নং প্রশ্নের জবাব ঃ

আমাদের শেষ প্রশ্ন ছিল মক্কা বিজয়ের পর আরবের মানুষ ইসলামকে যে অবস্থায় পেয়েছিল আমরাও কি ইসলামকে সে অবস্থায় পেয়েছি?

উত্তর ঃ তা অবশ্যই পাইনি। আমরা ইসলামকে সেই অবস্থাতেই পেয়েছি, যে অবস্থায় দুইশত বছরের ইংরেজ সরকার ইসলামকে ছেড়ে গেছে।

মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক অবস্থা আছে তা হচ্ছে এই— প্রত্যেকেই চায় যে আমি যে মতে আছি দুনিয়ার সবাই সেই মতে এসে যাক। আমরা এর নমুনা প্রতিনিয়তই দেখে আসছি। দেখুন, এ দেশের সর্বময় ক্ষমতা যেদিন মুসলিম লীগের হাতে ছিল সেদিন তারা চেয়েছিল দেশের প্রত্যেকেই মুসলিম লীগের হয়ে যাক। মানুষ তা হয়েছিলও।

অতঃপর যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এল তখন দেশের লোক প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ আওয়ামী লীগার হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই অবস্থা ঘটে বি এন পি যুগেও।

এইটাই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন চিন্তা করে দেখা দরকার যে ১৯০ বছর পর্যন্ত যারা এ দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল তখন তারা কি চায়নি যে এ দেশের সবাই তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে যাক? তা তারা অবশ্যই চেয়েছিল। তারা তা কিভাবে চেয়েছিল তার একটা ছোট নমুনা এখানে পেশ করা হল।

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে ওদের ধর্ম প্রচারকগণ মাঝে মাঝে ধর্মসভা করে লোকদের বুঝাত যে হযরত ঈসা (আ)-ই শেষ নবী। তারপর আর কোন নবী আসবে না। তোমরা মুসলমানরা যে নবীকে বিশ্বাস কর তিনি প্রকৃতপক্ষে জাল নবী (নাউযুবিল্লাহ)। একবার তারা কলকাতায় এরূপ একটা ধর্মসভায় রাসূল (স) এর বিরুদ্ধে প্রচার করছিল। এমন সময় সেখানে হঠাৎ করে মাওলানা শাহ্ আঃ আজিজ দেহলবী (র) এসে হাজির হলেন। [তিনি কয়েকদিন পূর্ব কলকাতা সফরে এসেছিলেন। এই সভার খবর পেয়ে তিনি দ্রুত সভাস্থলে চলে আসেন।] মাওলানা সাহেবকে যারা চিনতেন, তারা দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ পরিচয় জানতে পেরে মঞ্চে যথাযথ সম্মান করে বসতে দিলেন এবং মনে মনে তারা এক দুষ্ট পরিকল্পনা করেন যে মওলানা সাহেবকে এমন প্রশ্ন করব যে প্রশ্নের দ্বারা প্রমাণ করে দেব যে মুহাম্মদ (স) সত্য রাসূল নন (নাউযুবিল্লাহ)। তারা (খৃষ্টান পাদ্রীগণ) প্রশ্ন করল মাওলানা সাহেব! আপনারা তো বলে থাকেন মুহাম্মদ (স) শেষ নবী এবং তিনি আল্লাহর খুবই প্রিয় বন্ধু একথা কি ঠিক?

মাওলানা সাহেব ঃ হাঁ অবশ্যই ঠিক।

পাদ্রী ঃ আচ্ছা বলে থাকেন বেহেশ্‌তের মধ্যে গিয়ে আল্লাহর নিকট মানুষ যা চাইবে আল্লাহ তাই দিবেন– এটা কি ঠিক?

মাওলানা সাহেব ঃ হাঁ অবশ্যই ঠিক।

পাদ্রী ঃ আচ্ছা রাসূল নাকি তাঁর দুই নাতিকে খুবই ভাল বাসতেন– এটা কি ঠিক?

মাওলানা ঃ হাঁ অবশ্যই ঠিক।

পাদ্রী ঃ আচ্ছা ইমাম হুসাইন (রা)কে যেদিন শত্রুরা কারবালার মাঠে শহীদ করে সেদিন রাসূল (স) তো অবশ্যই বেহেশ্‌তের মধ্যে ছিলেন। কারণ তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। আর আল্লাহর নবী রাসূলগণ তো মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তেই থাকেন।

মাওলানা সাহেব ঃ তা, তিনি বেহেশ্‌তেই ছিলেন।

পাদ্রী ঃ আচ্ছা তিনি কি বেহেশ্‌তের ভিতর থেকে টের পেয়েছিলেন যে আমার স্নেহের নাতিকে শত্রুরা মেরে ফেলতে যাচ্ছে?

মাওলানা সাহেব ঃ হ্যাঁ, টের পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

পাদ্রী ঃ আচ্ছা তিনি যেহেতু আল্লাহর প্রিয় রাসূল ও বন্ধু এবং তিনি রয়েছেন বেহেশ্‌তের মধ্যে যেখান থেকে আল্লাহর নিকট যা চাওয়া যায় আল্লাহ তাই দিয়ে থাকেন কাজেই সেখানে বসে যদি তিনি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতেন যে আল্লাহ তুমি আমাকে শেষ নবী করেছ এবং আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং তুমি ওয়াদা করেছ যে বেহেশতের ভিতর থেকে যে যা চাইবে তাকে তাই তুমি দেবে। তোমার এই ওয়াদা মুতাবিক আমার প্রিয় নাতি হুসাইনকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে দাও। এরূপ বললেই তো আল্লাহ ইমাম হুসাইনকে উদ্ধার করে দিতেন। তিনি কি এরূপ মুনাজাত করেছিলেন আল্লাহর নিকট?

মাওলানা সাহেব ঃ হাঁ তিনি ঐরূপ মুনাজাত করেছিলেন কিন্তু দোয়া কবুল হল না।

পাদ্রী ঃ কেন কবুল হলনা তা'হলে তিনি কি করে শেষ নবী এবং আল্লাহর বন্ধু?

মাওলানা সাহেব ঃ আল্লাহ এই মুনাজাত কবুল করতে না পেরে একে বারে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

পাদ্রী হো হো করে হেসে উঠে বললেন, মাওলানা সাহেব আপনি এ কেমন কথা বললেন যে আল্লাহ মুনাজাত কবুল করতে পারলেন না এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন?

মাওলানা সাহেবঃ হাঁ, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন যেঃ বন্ধু! আপনি তো আমরা বন্ধু আর হুসাইন হচ্ছে বন্ধুর নাতি ছেলে, কিন্তু ঈসা যে আমার নিজের ছেলে তাঁকে যখন শত্রুরা শুলে চড়াল তখন নিজের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তো তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। আর তোমার নাতিকে আমি কিভাবে বাঁচাব?

পাদ্রীদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারা বলল, ওহ ইউ আর ভেরী ডেন্‌জারাস ফেলো?

এ কাহিনীটা পড়েছিলাম আমার পাঠ্য জীবনে দৈনিক আজাদে। যেমন পড়েছিলাম তেমনি মনে রেখেছি এবং তেমন করেই লেখার চেষ্টা করেছি। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করতে চেষ্টা করিনি।

www.pathagar.com

এ কাহিনী থেকে এটা পরিস্কার বুঝা গেল তারা তাদের ১৯০ বছরের শাসনামলে চেয়েছিল তারা যা বিশ্বাস করে আমাদের মধ্যে সেই বিশ্বাসই যেন ঢুকাতে পারে। তাদের এ চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়েছে? তা হয়নি । তাদের চেষ্টা যতদূর সফল করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

তাদের মূল আকীদা ও আমাদের মূল আকীদার মধ্যে যে পার্থক্য তা হচ্ছে ঃ ওরা বিশ্বাস করে—

১। মানব জীবনের দু'টি অংশ, যথা ঃ

(ক) দুনিয়াদারীর অংশ ঃ যে অংশের মহাপ্রভু হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান।

(খ) দ্বীনদারীর অংশ ঃ যে অংশের মহাপ্রভু হচ্ছেন পোপ।

তারা বিশ্বাস করে ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান কোন হস্তক্ষেপ করবেন না এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মপ্রধান কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। তারা বিশ্বাস করে এতেই একটা দেশে শান্তি বহাল থাকা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় কাজে যদি ধর্মীয় নেতাগণ কোন বাধার সৃষ্টি করে তাহলে রাষ্ট্রের সঠিক উন্নয়নমূলক কাজে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এই বিশ্বাসে তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মযাজকগণ কোন কথা বলেন না। এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা।

কিন্তু ইসলামের মূল আকীদা হচ্ছে এই যে— আমরা দুই মহাপ্রভুর অধীন নই; একই মহাপ্রভুর অধীন এবং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আমাদের মূল বিশ্বাস যে আমাদের জীবন দুইভাগে বিভক্ত নয়। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ হতে হবে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক তাতে আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপই ইবাদতে পরিণত হবে। আমরা বিশ্বাস করি اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম করার বা আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আমরা বিশ্বাস করি 'সৃষ্টি যার আইন তার'।

খৃষ্টানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আমাদের মধ্যে ঢুকানোর জন্য যত প্রকার ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে প্রধানতম ব্যবস্থা হল— কলকাতায় যখন প্রথম আলিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপিত হল তখন থেকে অর্থাৎ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ৭৭ বছর যাবত আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে পরপর ২৬ জন ইউরোপীয় খৃষ্টানকে নিয়োগ করা। তারা ধর্মীয় ব্যাপারে এমন কিছু উল্‌টা পাল্‌টা বুঝ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে যার প্রভাবে মুসলমানরা

www.pathagar.com

নামে মুসলমান থাকলেও কাজে যেন তা না থাকে। এমনকি আল কুরআনের স্পষ্ট হুকুমগুলোর মধ্যেও ওরা পরিবর্তন এনেছে অতি সুকৌশলে। যেমন— আল কুরআনে যেখানে নামাযকে ফরজ করা হয়েছে সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকেও ফরজ করা হয়েছে। স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে যেমন রোযার বিধান নাযিল হয়েছে তেমনই ইসলামী দণ্ডবিধি নাযিল হয়েছে। সেখানে তারা কুরআনের এই হুকুমগুলিকেও দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছে। এক ভাগকে দেখিয়েছে দুনিয়াদারী অংশে অন্যভাগকে দেখিয়েছে দ্বীনদারী অংশে। দ্বীনদারী অংশে নামায রোযাকে শামিল করা হয়েছে কাজেই নামায রোযা সমাজে আছে। পক্ষান্তরে চুরি করলে হাত কাটা, ডাকাতি করলে এক হাত এক পা কাটা, মানুষ খুন করলে কেসাস বা মৃত্যুদন্ড এ ধরনের শাস্তি, মদ ও যেনার শাস্তি, যেনার অপবাদ দেয়ার শাস্তি, এগুলিকে যদিও নামাযের ন্যায়ই ফরজ করে দেয়া হয়েছে তবুও ঐ ১৯০ বছরের শাসক গোষ্ঠী এটাকে দুনিয়াদারী অংশের মধ্যে শামিল করে দিয়েছে এবং আমাদেরকে শিখিয়েছে যে ওটা দুনিয়াদারী ব্যাপার, ওটা হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানদের উপর হুকুম ওটা রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের বুঝমত যা খুশী তা করতে পারেন। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হবে না। এই ধারণাই তারা আমাদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়েছে যে এইটাকেই আমরা ইসলামী ধারণা বলে মেনে নিচ্ছি। মানুষ যদি ভুলের উপর একবার দাঁড়িয়ে যায় তাহ'লে ভুলটাকে তার নিকট সঠিক মনে হয়। আর যা সঠিক সেইটাকেই তার নিকট ভুল বলে মনে হয়। এর বহু বাস্তব প্রমাণ আমার নিকট রয়েছে। এর কিছু উদাহরণ আমি 'বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান' নামক বইয়ে দিয়েছি। তার থেকেই একটা উদাহরণ পুনরায় দিচ্ছি। আমাদের এই বাংলাদেশেরই এক এলাকার লোক 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করে এবং 'হ' কে 'স' উচ্চারণ করে, ঐ এলাকার একজন প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল স্যার আপনারা 'স' কে কেন 'হ' বলেন এবং 'হ' কে কেন 'স' বলেন, তিনি তার জওয়াবে বলেছিলেন ওটা কোন শিক্ষিত লোকে বলে না, ওটা হাধারণে বলে। তখন পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, স্যার আপনিও তো বললেন, তিনি জওয়াব দিলেন, "ওটা সঠাৎ করে হয়ে গেছে।"

আমি দেখি এই অবস্থাই আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। আমরা মনে করি দ্বীনের ব্যাপারে কোন ভুল বুঝ থাকলেও তা সাধারণের মধ্যে রয়েছে আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি যে, আমরাও সেই হাধারণের মত হয়ে গিয়েছি।

www.pathagar.com

ইংরেজরা কমপক্ষে আমাদের মধ্যে এতটুকু ধারণা ঢুকাতে সক্ষম হয়েছে যে আমরাও জীবনকে দুই অংশে ভাগ করে নিয়েছি। এক অংশকে মনে করি দ্বীনদারী অংশ। ঐ অংশে আল-কুরআনে যা আছে তা হুবহু মেনে চলি কিন্তু জীবনের যে অংশকে দুনিয়াদারী অংশে মনে করি সেই অংশের কোন আইন কানুন যে আমাদের মেনে চলতে হবে এবং সেগুলিও যে ধর্মীয় ব্যাপার তা এখনও আমরা মানতে পারছি না এবং মানার মত মনও তৈরী হচ্ছে না। হচ্ছে না একটাই মাত্র কারণে যে আমরা জন্মের পর থেকেই খৃষ্ট্রীয় মতবাদকে আমাদের নিজস্ব মতবাদ হিসাবে পৈত্রিক সূত্রে পেয়ে বসেছি। এ ব্যাপারে আমি একটা বিষয় চিন্তা করতে বলব। তা হচ্ছে এই যে, একই কোম্পানীর একই মডেলের গাড়ী যদি হয় তা'হলে সে গাড়ী লন্ডনের রাস্তায় চলুক বা ঢাকার রাস্তায়ই চলুক কিংবা পিকিং এর রাস্তায় চলুক বা হংকং এর রাস্তায়ই চলুক চলবে একই পদ্ধতিতে এবং এসব গাড়ীরই পার্টস্ পত্র একটার সঙ্গে অপরটার মিল থাকবে। ঠিক তদ্রূপ একই আল্লাহর নিকট থেকে আসা আর একই নবীর মাধ্যমে ইসলামের বিধি-বিধান একই প্রকার হ'তে হবে এইটাই যুক্তি। যুক্তি হচ্ছে এই যে সাহাবা আমলের সমাজ ব্যবস্থা, আইন কানুন, প্রথা প্রচলন, বিচার আচার যেমন ছিল তার সব কিছুই এখনও সেই রূপ থাকতে হবে। কারণ তখনকার যা ঈমান আকীদা এখনকারও সেই ঈমান আকীদা। তাঁরাও যার নিকট থেকে ইসলাম পেয়েছেন আমরাও তাঁরই নিকট থেকে ইসলাম পেয়েছি। তাঁরা যে বেহেশ্‌তে যেতে চান আমরাও সে বেহেশ্‌তে যেতে চাই। কাজেই একই বেহেশ্‌তে যাওয়ার জন্যে তাদেরও যে ভাবে যা কিছু করা লেগেছে আমাদেরও সেইভাবে তার সব কিছু করতে হবে। এইটা এত সহজ যুক্তি যে ২য় শ্রেণীর ছোট্ট বাচ্চার মাথায়ও এটা ধরা পড়বে। কিন্তু বাস্তবে কি সেই সাহাবা যুগের ইসলামী আইন কানুন ও পুরা সমাজ ব্যবস্থা এ যুগে আমরা পেয়েছি? তা যদি না পেয়ে থাকি তা'হলে প্রশ্ন, সেই ধরনের সমাজ গড়ার কাজ আমাদের করতে হবে কি হবে না? আসুন এসব কিছু চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের বিদায় হজ্জের শেষ নসিহতটা শুনি এবং তা যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা সহকারে বুঝার চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জের ভাষণ

সূরা নসর নাযিল হওয়ার পর যখন রাসূল (স) বুঝলেন যে তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে আসছে এবং আগামী হজ্জে তাঁর উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না তখন তিনি ১০ম হিজরীর জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ রোজ শুক্রবার[১] উপস্থিত প্রায় সোয়া লক্ষ মুসলমানকে সম্বোধন করে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। আল্লাহর হামদ ও সানার পর তিনি এরশাদ করলেন ঃ

তওহিদ ঃ

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক এবং তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বা তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি একমাত্র মা'বুদ।"

মাবুদের অর্থ ঃ عِبَادَةٌ (ইবাদাতুন) অর্থ দাসবৃত্তি عَابِدٌ، عَبْدٌ অর্থ দাস বা যে দাসত্ব করে। مَعْبُوْدٌ অর্থ যার দাসত্ব করা হয়। তাহলে আল্লাহর সাথে তার বান্দার সম্পর্ক হল আল্লাহ হুকুম করবেন আর বান্দা তা মেনে চলবে। তার কোন সমকক্ষ নেই এর অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া আর এমন কেউই নেই যে মানুষের উপর হুকুম করতে পারে এবং মানুষ তার হুকুম মেনে চলতে বাধ্য হতে পারে।

---

১. এ ভাষণটা দিয়েছিলেন ১০ম হিজরীর জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ রোজ শুক্রবার। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এর প্রমাণ মিলে যে, দিনটা সত্যই ৯ই জিলহজ্জ ছিল এবং শুক্রবার ছিল। তাই যদি হয় তবে দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন এসে হাজির হয় তা হল হুজুর (স) এর ইন্তেকাল হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসের কোন তারিখে সোমবারে? চাঁদের মাস সাধারণতঃ একটা মাস উনত্রিশ দিন ও পরবর্তি মাস ত্রিশ দিন এই নিয়মেই হয়ে থাকে। কাজেই এই নিয়ম মুতাবিক দেখা যায় ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার হ'লে এবং মাস যদি উনত্রিশ দিনে যায় তা'হলে উনত্রিশ তারিখ বৃহস্পতিবার। মুহাররাম মাস শুরু হবে শুক্রবারে। ঐ মাস ৩০ দিনে গেলে মাস শেষ হবে শনিবারে। ১লা সফর হবে রবিবার। ২৯শে সফর রবিবারে মাস শেষ হবে। রবিউল আউয়াল মাসের ১লা তারিখে হবে সোমবার। কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক রাসূল (স) এর মৃত্যু দিবস ছিল ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার। তাদের মত এ হিসাব অনুযায়ী ঠিক। আবার কোন কোন বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (স) এর জন্ম তারিখ ছিল ৯ তারিখ। তাওয়ারিখে ইসলামে এই তারিখই লেখা হয়েছে। যদি এই ৯ তারিখই হুজুর (স) এর মৃত্যু দিবস হয়ে থাকে তা'হলে ৯ তারিখ মাত্র একটাই কারণে সোমবার হতে পারে তা'হল যদি

www.pathagar.com

ইবাদাত ঃ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করার অসিয়ত করছি এবং এর উপর নির্দেশ দান করছি।"

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ বলেছেন —

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদাত করা ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এর থেকে প্রমাণ হল মানুষ যাই করুক না কেন তাতে ইবাদাত হতে হবে। আর যে কাজ করলে ইবাদাত হবে না তা মানুষ করতে পারে না। অর্থাৎ এমন কোন কাজ করার অনুমতি রইল না যে কাজে ইবাদাত হয় না। তা'হলে কোন কাজ করলে ইবাদাত হবে আর কোন কাজ করলে ইবাদাত হবে না এটা অবশ্যই জানতে হবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ইবাদাত অর্থ দাসত্ব, আবেদ অর্থ যে দাসত্ব করে আর মাবুদ অর্থ যার দাসত্ব করা হয়। দাসত্ব করার অর্থ হল মুনিব হুকুম করবেন আর যারা দাস তারা তা মেনে চলবে। এইটারই বাংলা নাম দাসত্ব করা আর আরবী নাম ইবাদাত করা। তা হ'লে গোটা জীবনের যাবতীয় কাজকে ইবাদাতে পরিণত করতে হলে আমরা যে কাজই করি না কেন তা যদি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক করি তা'হলে আমাদের জীবনটাই হবে ইবাদাতের জীবন । অর্থাৎ আমরা যখন পথ চলি তখন যে ভাবে আল্লাহ পথ চলতে বলেছেন সেই ভাবে পথ চললে পথ চলাটাই ইবাদাতের মধ্যে শামিল হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ নামাযটা যেভাবে আদায় করতে বলেছেন সেভাবে যদি আদায় না করি তা'হলে নামাযেও ইবাদাত হবে না।

ঘটনাক্রমে জিলহজ্জ মাস থেকে সফর মাস পর্যন্ত কোন দুই মাস পর পর ২৯ দিনে হয়ে থাকে তা'হলে ঐ বছরের ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার এবং ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার হ'তে পারে। এছাড়া ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার হলে ঐ বছরের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হতে পারে না। ৯ই জিলহজ্জ বিদায় হজ্জের ভাষণ যদি সোমবার হয়ে থাকে তা হলেই ঐ বছর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হওয়া সম্ভব। এছাড়া চাঁদের মাস যেহেতু ৩১ শে বা ৩২ শে হয় না তাই ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার হলে ঐ বছর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হওয়া অসম্ভব। যা হোক এ বিতর্কিত বিষয়টি শুধু মাত্র হুজুরের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য আলোচনা করা হল।

www.pathagar.com

আবার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর বিধান মুতাবিক ব্যবসা বাণিজ্য করি তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যও ইবাদাতে পরিণত হবে আর যদি কোন ঈদের দিনে রোযা থাকি তা'হলে রোযা থাকা হবে ঠিকই কিন্তু তাতে ইবাদাত তো হবেই না বরং গোনাহ হবে। অর্থাৎ যে কাজই আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমতি মুতাবিক হবে সেই কাজেই ইবাদাত হবে। অন্যথায় কোন কাজই ইবাদাত হিসাবে গণ্য হবে না। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল আমরা যাই করি না কেন, তা কৃষি কাজ হোক বা ব্যবসা বাণিজ্য হোক কিংবা চাকুরী বাকুরী হোক বা যুদ্ধ সন্ধি চুক্তি যাই হোক না কেন তা আল্লাহর বিধান মুতাবিক হলেই তাতে ইবাদাত হবে। আর রাসূল সেই কথাই বললেন "তোমরা আল্লাহকেই মা'বুদ বলে মানবে এবং আর কাউকে মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করবে না।"

আল-বিদা ঃ

হে লোক সকল। তোমরা আমার কথা শোন, এর পর এই স্থানে তোমাদের সাথে হয়ত আর দেখা হবে না। হয়ত আর তোমাদের সাথে একত্রিত হতে পারব না।

ব্যাখ্যা ঃ কি করে তিনি বলতে পারলেন যে আর একত্রিত হতে পারব না। বুঝলেন এই জন্যে যে আল্লাহ ওহি নাযিল করে বলে দিয়েছেন যে তোমাকে যে কাজে পাঠান হয়েছিল সে কাজ শেষ হয়ে গেছে। এর থেকে আরও একটা বিরাট যুক্তি উদ্‌ঘাটিত হল তা হচ্ছে এই যে দুনিয়ার কোন মানুষই কোনদিন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে এভাবে বলতে পারেননি যে, আমি সামনের বছরের এই দিন পর্যন্ত বাঁচব না। যদি তিনি সত্যই নবী না হতেন আর আল্লাহর ওহি যদি না আসত তাহলে কোন প্রকারেই তিনি বলতে পারতেন না যে হজ্জের মাঠে এইটাই তাঁর শেষ ভাষণ।

সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ঃ

"হে লোক সকল! আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।"

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ সমাজের কোন মানুষই ছোট জাতের নয়। ছোট হচ্ছে তার কার্যকলাপ। সে আপন যোগ্যতা ও সাধনা বলে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে এবং পারে রাসূলের বংশে জন্ম নিয়েও আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মত হতে। বংশ গৌরব আসলে কোন গৌরব নয়। গৌরব হল আমল ও আখলাকের। রাসূলের ভাষণের মাধ্যমে গোষ্ঠীভিত্তিক জাতি গঠনের নীতিকে বাতিল করে দেয়া হল। পক্ষান্তরে মর্যাদার ভিত্তি যে তাকওয়া, তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হল।

মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া ঃ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিক মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর কথা অধিক পরিমাণে খেয়াল রাখে।"

ইসলামে জাতি, শ্রেণীভেদ ও বর্ণ বৈষম্য নেই ঃ

হুজুর (স) বললেন! "আরবের উপর অনারবের যেমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই তেমন অনারবের উপরও আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনই নেই সাদার উপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কালোর উপর সাদার শ্রেষ্ঠত্ব।"

ব্যাখ্যা ঃ – শ্রেণী ভেদাভেদ ও বর্ণবৈষম্য চিরতরে খতম করে দেয়া হল। যার কারণে এখনই যদি কোন মেথরের ঘরের ছেলেও মুসলমান হয়ে কুরআন হাদীস শিখে মুত্তাকী হ'য়ে যায় তবে তাঁর পিছনে সৈয়দ বংশের কোন রাষ্ট্রপ্রধানও বিনা দ্বিধা সংকোচে নামায আদায় করবেন এবং ঐ নওমুসলিম যে কোন উচ্চ বংশের মেয়ে বিবাহ করতে তার উপরে কোন বিধি নিষেধ থাকবে না। এইটাই ইসলামের এক তুলনাহীন মহত্ব।

সকল অহংকারের দাবী আজ থেকে রহিত করা হল ঃ

"তোমরা সকল মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী। এক্ষণে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবী, রক্তের দাবী, অর্থের দাবী, পূর্বের সকল প্রকার প্রতিশোধ নেয়ার দাবী সবই আমার পায়ের নীচে পদদলিত হল।"

ব্যাখ্যা ঃ আজ থেকে জাহেলী যুগের আশরাফ-আতরাফ এর ধারণা বাতিল করে দেয়া হল।

www.pathagar.com

কা'বা শরীফের হেফাজত ও হাজীগণের খেদমত ঃ

"কা'বা ঘরের হেফাজত এবং হাজীগণের পানি পান করানোর ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় এখনও বহাল থাকবে।"

প্রত্যেকেই যার যার আমলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে ঃ

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকগণ! তোমরা দুনিয়ার বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে যেন আল্লাহর দরবারে হাজির না হও। আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের কোনই উপকার করতে পারব না।"

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু কুরাইশ বংশে রাসূলের জন্ম, তাই সারা দুনিয়ার মানুষ মনে করে, কুরাইশরা যা করে ঐটাই ইসলাম। কুরাইশরা যদি সত্যিকার অর্থে সঠিকভাবে ইসলামের উপর কায়েম থাকে তাহ'লে দুনিয়ার মানুষ সঠিক ইসলাম কুরাইশদের নিকট থেকে দেখে শিখবে।

আর যদি কুরাইশরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় তাহ'লে সারা দুনিয়ার মানুষ মনে করবে কুরাইশরা ইসলামের যেটুকু পালন করে ঐটুকু পালন করলেই চলবে এবং কুরাইশদের যাবতীয় কার্যকলাপই সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য অনুকরণ ও অনুসরণ যোগ্য। ফলে কুরাইশরা ভুল করলে তাদের দেখাদেখি সারা দুনিয়ার মানুষ ভুল করবে। এরই নাম হল সারা দুনিয়ার বোঝা ঘাড়ে নেয়া।

আজ যদি আমরা সৌদী আরবের লোকদের দেখি ঘরে ঘরে টেলিভিশন চালাচ্ছে। আর তাতে সব ধরনের অশ্লীল ছবি দেখান হচ্ছে তাহ'লে আমরা মনে করব, ওটায় কোন দোষ নেই, ওটা জায়েয।

যদি তাদেরকে দেখি নানাভাবে অর্থের অপচয় করতে তাহ'লে ঐটাই হবে আমাদের জন্য ফতোয়া।

তারা যদি দাড়ী মুন্ডন করে তবে সেটা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে জায়েয হয়ে যাবে।

আর তারা যদি খেলাফত কায়েম করে তাহ'লে দুনিয়ার মানুষ মুসলমানদের জন্যে খেলাফত প্রয়োজন মনে করবে। তারা যদি রাজতন্ত্র কায়েম করে তাহ'লে রাজতন্ত্র জায়েয হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

তাঁরা বর্তমানে কোনটা করছে বা কোনটা করছে না এটা আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য হল তারা সঠিক মত চললেও ঐটাকে দুনিয়ার মানুষ সঠিক মনে করবে আর বেঠিক মত চললেও সেটাকে দুনিয়ার মানুষ সঠিকই মনে করবে। এজন্যে রাসূল (স) তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, খবরদার! তোমরা যেন দুনিয়ার বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির না হও।

তাদের দেখাদেখি যদি দুনিয়ার মানুষ ভুল পথে চলে তাহ'লে কেয়ামতে যখন দুনিয়ার তামাম মুসলমানকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন তোমরা কেন ভুল পথে চললে? তার জবাবে সবাই একই কথা বলবে। বলবে হে দয়ালু আল্লাহ আমরা তো কুরাইশদের বা সৌদী আরবের অনুকরণ অনুসরণ করেছি। তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে। তখন তো সৌদী সরকারকেই বা কুরাইশ নেতাদেরকেই এই গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের ভুলের খেসারত দিতে হবে। এই জন্যেই আদর্শ স্থানীয়দের জন্যে পৃথকভাবে নির্দেশদান করলেন।

এই নির্দেশের ভিতর থেকে আরও একটা শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে তাহল এই যে সমাজের আলেম পীর মাশায়েখ— যাদেরকে সাধারণ মুসলমান অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য মনে করেন তারা যদি ভুল পথে চলেন তবে তাদের দেখাদেখি যারা ভুল পথে চলবে তাদের সবার ভুলের বোঝা সেইসব আলেম ওলামা পীর মাশায়েখগণের ঘাড়েও চাপবে যাদেরকে অনুসরণ করেই সাধারণ মানুষ ভুল করেছে।

ঠিক তেমনই কোন দেশের কোন দল বা কোন সংগঠন যদি নিজেদেরকে ইসলামের ব্যাপারে আদর্শ স্থানীয় বলে সমাজের সম্মুখে পেশ করে, আর এর পর যদি তারা কোন ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে সেই ভুলের দায় দায়িত্ব তাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে যারা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কাজেই যারাই যেখানে থেকে আদর্শ স্থানীয়দের ভূমিকায় রয়েছেন তাদেরই ভয় আছে অন্যের গোনাহর বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপার।

তাই এমনটি যেন না হয় সে জন্যে আল্লাহর রাসূল (স) পূর্বাহ্নেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এরূপ করে যদি আল্লাহর দরবারে হাজির হও তাহলে আমি তোমাদের কোনই উপকার করতে পারব না। তখন এক বিরাট জনগোষ্ঠীর গোনাহর বোঝা বইতে হবে। এর অর্থ অন্যদেরকে ভুল পথ দেখানোর কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

জাহেলী প্রথা পদদলিত ঃ

"তোমরা শুনে রাখ! সকল জাহেলী প্রথা ও বিষয়াদি আজ আমার পদতলে দলিত করা হল। জাহেলী যুগের রক্তের দাবী রহিত করা হল। সর্ব প্রথম আমি আমার কবিলার রক্তের দাবী অর্থাৎ রবীয়া ইব্‌নুল হারিসের পুত্রের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করছি। বনু সা'দ গোত্রে থাকা কালিন হুজাইলারা তাকে হত্যা করেছিল।"

সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা ঃ

"আজ জাহেলী যুগের সুদও রহিত করা হল। সর্ব প্রথম আমি আমার কবিলার সুদের দাবী অর্থাৎ আমার চাচা হযরত আব্বাস (রা) এর সুদ মা'ফ করে দিলাম সুতরাং আজ থেকে সুদ রহিত হয়ে গেল।"

ব্যাখ্যাঃ আমাদের দেশে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা থাকার কারণে যারাই ব্যাংকে টাকা রাখেন তাদেরই এক পর্যায়ে সুদের একটা অংক পাওনা হয়ে যায়। এই সুদও হারাম ঘোষণা হয়ে গেছে। এই সুদের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে ফেলে দিতে হবে। তবে একেবারে ফেলে দেয়ার চাইতে বহু অসহায় মানুষ বাংলাদেশে রয়েছে তাদেরকে দিয়ে দেয়া আমার মতে ভাল। ছওয়াবের নিয়তে নয়; তবে মানুষের উপকার হবে এই নিয়তে কাউকে দিয়ে দেবে। অনেকে ফতোয়া দেন যে কোন মসজিদের পায়খানা করে দেয়া ভাল। আমি বলব ভাল তো ঠিকই কিন্তু তারও উপরে আরেকটা ভাল আছে। তা বুঝতে হলে বস্তি এলাকায় একটু মেহনত করে যাওয়া লাগবে। তা হলেই বুঝা যাবে। কোন মসজিদের প্রস্রাবখানা পায়খানার জন্যে এ ধরনের টাকার কাজ আটকে থাকে না কিন্তু বস্তিতে যারা বাস করে কিংবা শহরের রাস্তার পাশে নর্দমার উপর যারা ছোট্ট ছোট্ট ঝুপড়ি ঘর করে বাস করে তারা যেখানে বসে খায় সেখানে বসেই নর্দমার মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করে। আর একটু ঝড় বৃষ্টি হলে তাদের কি যে দুরবস্থা হয় তা চোখে না দেখলে বড় লোকেরা অনুমান করতে পারেন না। তারা যেদিন দীনমজুর খেটে দু'পয়সা আয় করে সেদিন দুটো খায় আর যে দিন কাজ জোটে না সেদিন পেটে গামছা বেধে উপোস পড়ে থাকে। আমার ন্যায় অনেকেই স্বচক্ষে তাদের দেখেছেন যে তারা যদি কোন প্রকারে চাউল ও কিছু তরিতরকারী যোগাড় করতে পারে তবে রাস্তার পাশ থেকে খুঁজে নিয়ে ৩টি ইট যোগাড় করে,

www.pathagar.com

তা-ই ত্রিভুজ আকারে সাজিয়ে একটা সাময়িক চুলা তৈরী করে নেয়। এর পর রাস্তার পাশ থেকে কিছু শুকনো পাতা জোগাড় করে তাই দিয়ে রান্না করে। রান্না করে একেবারে বিরানীর কায়দায়। অর্থাৎ সবকিছু এক সঙ্গে দিয়ে রান্না। বাস, রান্না হয়ে গেলে যদি ভাঙ্গাচুরা বাসন কোসন থাকে তবে তাতেই ঢেলে নিয়ে সবাই মিলে খাওয়া শুরু করে। নইলে কলার পাতাটাতা একটা কিছু যোগাড় করে তাতেই করে খেয়ে নেয়। খাওয়া হ'য়ে গেলে ইটগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে দেয়, ছাইগুলো কিছু দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তখনকার মত সংসারের ইতি টেনে দেয়। এই হল কিছু বনি আদমের অবস্থা। কাজেই এ ধরনের জীবন যাপন করা লোক যে দেশে আছে সে দেশে ফেলে দেয়ার মত অর্থ আমার দৃষ্টিতে এরাই কুড়িয়ে নেয়ার যোগ্য।

মানবাধিকার ঃ

"হে লোক সকল! তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের সম্পদ একে অপরের জন্যে চিরদিনের মত হারাম করে দেয়া হল। যেমন আজকের এইদিন, এইমাস, তোমাদের এ শহর সকলের জন্যে হারাম।" অর্থাৎ মানুষের জীবন, মান ইজ্জত ও ধন সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হল। যে তিনটে জিনিসের নিরাপত্তার অভাবে সমাজে চরম অশান্তি নেমে আসে তার পরিসমাপ্তি ঘটান হল। ফলে এখন থেকে যাবতীয় ভয় ভীতি দূর করা হল এবং পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হল। এটা সম্ভব হল একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে।

প্রত্যেককেই যার যার নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে ঃ

তোমরা শীঘ্রই আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। সে দিন তোমাদের সকলকেই তোমাদের নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে। শুনে রাখ, অপরাধের দায়িত্ব অপরাধীর ঘারেই চাপে। পিতা পুত্রের অপরাধের জন্য এবং পুত্র তার পিতার অপরাধের জন্য দায়ী হবে না।

নারীদের অধিকার ঃ

"ওহে লোক সকল! আমি নারীদের সম্পর্কে তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। তোমরা যখন তাদের উপর নির্মম ব্যবহার কর তখন আল্লাহর শান্তি

www.pathagar.com

সম্পর্কে নির্ভীক হয়ো না। তোমরা অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর জামিনে গ্রহণ করেছ এবং তারই কালেমার মাধ্যমে তাদের সাথে তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক হয়েছে। জেনে রেখ, তাদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার আছে তেমন তোমাদের উপরও তাদের অধিকার আছে সুতরাং তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তোমরা আমার নসিহত গ্রহণ কর।"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পরিষ্কার করে বলা হল যে শুধু তাদের উপরই যে তোমাদের অধিকার আছে তা নয়; তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে। আরও বলে দেয়া হল যে তোমরা আল্লাহর জামিনে তাদেরকে গ্রহণ করেছ। তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাবে না।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার— তা হচ্ছে এই যে, আমাদের এই দেশের অধিকাংশ লোকের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ছিল হিন্দু কিংবা বৌদ্ধধর্ম। তারা মেয়েদেরকে মনে করত দাসীর জাত। যেমন মনে করত আরবের জাহেলী যুগে।

আমরা এই দুষ্ট ব্যধি থেকে সমাজকে এখনও মুক্ত করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এখনও হর হামেশা খবরের কাগজের পাতায় খবর পড়ি অমুক স্থানে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন। এছাড়া পাড়া গাঁয়ে এখনও স্ত্রীকে গরু পেটা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীগণও বুঝে যে এটা তো মেয়ে জাতের পাওনা। কাজেই মার না খেয়ে যাচ্ছি কোথায়! মেয়ের মা বাপও মনে করে যে জামাই মারলে সেখানে বলার কিছু নেই। সমাজ মনে করে এ ব্যাপারে কোন সালিস বিচার হতে পারে না। কারণ এটা স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার। কোর্টেও এর কোন বিচার নেই কারণ এটা স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় বললেন তাদের উভয়ের উপর উভয়ের অধিকার রয়েছে। তবে দুইজন মিলে যখন একটা সংসার গড়বে তখন সংসারে একজনকে প্রধান থাকতে হবে। সেই জন্যে আল্লাহ পুরুষকে প্রধান থাকার মর্যাদা দিয়েছেন তাই সংসারের অনেক বেশী দায়িত্ব পুরুষকেই পালন করতে হয়। পুরুষের প্রাধান্য যেন বহাল থাকে সেজন্যে সমাজে কিছু আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন–

(১) বয়সের দিক থেকে পুরুষ ছেলের বয়স বেশী হয়ে থাকে। যেন বয়সের দিক থেকে স্ত্রী নিজেকে কম দায়িত্বশীল মনে করতে পারে এবং স্বামীর

www.pathagar.com

প্রাধান্য মেনে নিতে পারে। এছাড়া স্ত্রীর বয়স স্বামীর চাইতে কম হতেই হবে এটা ইসলামের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নয়।

(২) লেখা পড়ার দিক থেকেও স্বামীর চাইতে স্ত্রীর লেখা পড়া কম থাকা সমাজ প্রয়োজন মনে করে। যেন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে নিজেকে খাট মনে করতে পারে এবং পারে যেন সহজভাবে স্বামীকে সংসারের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে মেনে নিতে।

(৩) বিবাহের পর তারা সংসার গড়ে তোলে স্বামীর পিত্রালয়ে যেন উভয়ের অবস্থানের স্থানটিতে স্বামীর অধিকার একটু বেশী একথা যেন স্ত্রী সহজভাবে মেনে নিতে পারে। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে ইসলামে এ তিনটির একটিকেও শর্ত হিসাবে ধরা হয় না। বরং শর্ত হল বিবাহের ব্যাপারে—

(১) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের খুশী মনে সম্মতি।

(২) সামাজিক স্বীকৃতির জন্যে সাক্ষীর প্রয়োজন এবং

(৩) দেন মোহর আদায়ের মাধ্যমে স্ত্রীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছু সম্পদের মালিকানা দান করা যেন স্ত্রী নিজেকে বিবাহের পর নিঃসম্পদ মনে না করে।

আর বলা হয়েছে "আর্‌রিজালু কাউয়ামুনা আলান্ নিসায়ে"। অর্থাৎ পুরুষকে স্ত্রীর উপর নেতা নিযুক্ত করে দেয়া হল। এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে তাকে গরু পেটা করার অধিকার দেয়া হল।

যেমন কোন প্রাইমারী স্কুলে ২ জন শিক্ষক হলে তার মধ্যেই একজন প্রধান শিক্ষক হন। এর অর্থ এ নয় যে প্রধান শিক্ষক তার সহকারী শিক্ষককে গরু পেটা করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন।

দুইজন এক সঙ্গে নামায পড়লে তার মধ্যে একজন ইমাম হয়ে নামায পড়েন। ইমাম হয়ে নামায পড়ার অর্থ এ নয় যে, ইমাম সাহেব তার মুক্তাদীকে পিটিয়ে মারার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। ঠিক তেমনই স্ত্রীর উপর স্বামী নেতা হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তাকে পিটানোর অধিকার দেয়া হয়েছে।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে আমরা মেয়েদের অধিকার নিয়ে যতই চিৎকার করি না কেন আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে মেয়েদেরকে আমরা কতটুকু

www.pathagar.com

মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে পেরেছি? আমরা তো দেখি যারাই মেয়েদের অধিকার নিয়ে চিৎকার করি তারাই যখন ছেলে বিয়ে দিয়ে একটা বৌ ঘরে আনতে যাই তখন মেয়ের অভিভাবকের নিকট দাবী করি কিছু টাকা পয়সা বা মাল সম্পদের। যা না হলে বিবাহই হচ্ছে না। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি যে একটা মেয়েকে তার মানব সত্তার মর্যাদা দিতে পারছিনা, সম্মানিতা মানবী হিসাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারছি না। যখন একটা মেয়ে + কিছু ধন সম্পদ পাই তখনই সে মেয়ে স্ত্রী হওয়ার যোগ্য হয়। প্রকৃত ব্যাপার তাই নয় কি?

এ ছাড়াও আমরা লক্ষ্য করছি যে এ যুগের কোন একটি মেয়েই খারাপ নয় এবং কোন একটি বউ ভাল নয়। অর্থাৎ যখন মেয়ে মায়ের নিকট তখন সে খুবই ভাল কিন্তু যখন সে শাশুড়ির নিকট তখন সে খুবই খারাপ। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে— "আমাদের মেয়েও শাশুড়ির ঘরে যায়?" এ সবই আমাদের ভেবে দেখা উচিৎ। শ্বশুড় শ্বাশুড়ির উচিত নিজের মেয়েকে যে নজরে দেখেন ঠিক সেই একই নজরে বউদের দেখা। কারণ আপনার কন্যাই অন্য পরিবারে বউ হিসাবে জীবন কাটাচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কখনও সম্পদ যোগ হওয়া ঠিক নয়। এমন কি রাসূল (স) অন্যত্র বলেছেন যারা স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করবে তারা দোজখী হবে। বিবাহে সম্পদ শর্ত করে এবং আদায় করে ছেলে মেয়ে বিবাহ দেয়াও মানুষ বিক্রির সমান। কাজেই এত বড় শক্ত গোনাহকে আমাদের ভয় করে চলা উচিৎ যদি আমরা সত্যই পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকি।

এখানে একটা কথা মুসলমানদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে যৌতুক প্রথাটা মুসলমানী প্রথা নয়। এটা হচ্ছে হিন্দুয়ানী প্রথা। হিন্দু ধর্ম থেকে আমরা অনেক কিছুই গ্রহণ করেছি। যেমন–

(১) ছয় যষ্টির কামান।

(২) দেবর ভাশুরের পার্থক্য।

(৩) রবিবারে বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা যাবে না।

(৪) পৌষ মাসে গোলা থেকে ধান বের করা যাবে না।

www.pathagar.com

(৫) বুধবারে কাউকে ধান চাউল কর্জ দেয়া যাবে না।

(৬) বছরের প্রথম ধান বোনার দিন পথে চিটে ধান ছড়াতে হবে।

(৭) পৌষ মাসে মেয়ে জামাই দাওয়াত করে খাওয়াতে হবে। ইত্যাদি ধরনের বহু হিন্দুয়ানী প্রথার সঙ্গে এই দুষ্ট যৌতুক প্রথাও মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে।

যৌতুক প্রথার মূল তাৎপর্য হল এই যে হিন্দু মেয়েরা পিতার সম্পত্তি পায় না। এই জন্যে ওরা বিবাহের সময় এ নামে সে নামে কিছু পিতার নিকট থেকে আদায় করে নেয়। কারণ তারা জানে যে পিতা কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক হলেও মেয়ের তাতে কিছু পাওনা নেই। এই জন্যে তাদের মধ্যে যৌতুক প্রথা গড়ে উঠেছে। আর এটা তাদের মধ্যে খাপ খায় এই জন্যে যে ঐ সমাজের মেয়েদের পিতার অর্থে কোন অংশ নেই। কিন্তু ইসলামে তা নয়; ইসলামে এটাকে রদ করা হয়েছে। ইসলাম ছেলের অর্দ্ধেক মেয়ের জন্য ঠিক করে দিয়েছে। সে বিবাহের পরে তার পিতার অবর্তমানে পিতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। কাজেই বিবাহের সময় চাপ প্রয়োগ করে অর্থসম্পদ আদায় করে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া হিন্দুদের যৌতুক প্রথায় এক দিক থেকে জুলুম হয় না কারণ তাদের মেয়েরা ঐ এক বারই যা জোর-জুলুম করে নিতে পারে, তার পরে আর কিছুই পায়না কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে যৌতুকে জুলুম হয়। এই জন্যে এটা হারাম। কারণ যৌতুকে যা অর্থ মেয়ে নিয়ে নেয় ঐটার মধ্যে ছেলেদের অংশ থাকে। কাজেই পরে মেয়েরা যখন পিতার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে যায় তখন হিসাব করলে দেখা যায় তাদের বেলায় আল্লাহ যা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন তার থেকে বেশী নেয়া হয় ততটুকু যতটুকু বিবাহের সময় নিয়েছিল। সেটা প্রকৃতপক্ষে ভাইদের অংশ থেকেই তারা নিয়েছিল। এই জন্যে আবার ইসলামের মধ্যে একটা দুষ্ট প্রথা ঢুকে যাচ্ছে। সেটাও হচ্ছে ঐ হিন্দু সমাজের প্রথা। এখন দেখা যায় বোনদেরকে পিতার সম্পত্তি থেকে না দিয়ে পারলে আর কেউ দিতে চায় না। কিন্তু ভাইয়েরা বুঝে না যে এটা তাদের জন্যে হালাল নয়।

www.pathagar.com

আমাদের আরও একটা কথা বুঝা উচিৎ যে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের মধ্যে এমন একটা পরস্পর যোগসূত্র রয়েছে যে তার যে কোন একটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটালে তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া অন্য একটির উপর পড়বেই। ফলে গোটা সমাজ নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

এই জন্যেই আল্লাহ বলেছেন – اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّا

"ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হয়ে যাও।" দেখুন সহজ যুক্তি হচ্ছে এই যে গাড়ীটা যদি হয় সাইকেল গাড়ী তাহলে তার পার্টস পত্র সবই হতে হবে সাইকেল গাড়ীর। গরুর গাড়ীর কোন পার্টস পত্র সাইকেলে ফিট হবে না। তেমন ধর্মটা যেখানে ইসলাম সেখানে তার প্রত্যেকটি আইন কানুন মেনে নিতে হবে ইসলামের। গরুর গাড়ীতে গরুর গাড়ীর চাকা ফিট হবে কিন্তু সাইকেলে তা ফিট হবে না। ঠিক তেমনই যৌতুক প্রথা হিন্দু ধর্মে খাপ খেলেও ইসলামে তা খাপ খাবে না।

নারী জাতির জন্যে অনেকেরই চোখ দিয়ে পানি ঝরে কিন্তু তারা কি খবর রাখেন যে মেয়েরা কেন আত্মহত্যা করে? এর কারণ মেয়েদেরকে এ সমাজ মাতৃজাতির মর্যাদা দিতে পারেনি এখনও। গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদেরকে একটু লেখা পড়া শেখালেই বিপদ। তাকে এক দিকে মূর্খ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায় না অপর দিকে একটু লেখা পড়া জানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে গেলে শুধু মেয়ে দিলে চলে না তার সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা মাল আসবাব দেয়া লাগে। তা না দিতে পারলে বিয়ে হয় না। অনেক সময় এমনও হয় যে মেয়েকে মারধোর করলে মা-বাবা নেহায়েত ঠেকে পড়ে হয়ত কিছু জামাইকে দেয় আর ওয়াদা করে যে ৩ মাস বা ৬ মাসের মধ্যে আরও কিছু দেবে। নিয়ত ঠিকই থাকে যে যেভাবেই হোক দেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতে পারে না। তখন চাপ সৃষ্টি হয় মেয়ের উপর। স্বামী বলে, যাও বাপের বাড়ী থেকে একটা হোন্ডা নিয়ে আসতে পারলে আসবে নইলে আর এসো না। বাপের বাড়ী গিয়ে যখন বলে যে হোন্ডা না হলে আমি আর শশুর বাড়ী যাব না। বলে, শাশুড়ী যেমন শশুরও তেমন। তারা প্রায়ই বলেন তোমার মা বাপের কোন বোধ শক্তি নেই। তারা

www.pathagar.com

বুঝে না যে শিক্ষিত জামাই হলে কি দেয়া লাগে? সবাই একভাবে মুখ মলিন করে, আমি এত আর সহ্য করতে পারিনে। মা-বাপ বুঝায় যে, কি করব, তুমি দেখছনা যে কিভাবে টানাটানি করে সংসার চলে। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে চায় না, তবু মা-বাপ বলে কয়ে পাঠায়। কিন্তু শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পৌছার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন আসে, কৈ হোন্ডা কৈ? তখন মেয়ের মনটা হয়ে পড়ে খুবই দুর্বল। সে তখন মনে মনে চিন্তা করে আমি এ মনোপীড়া হতে বাঁচব কি করে। এই দুর্বল মুহূর্তে শয়তান তাকে পরামর্শ দেয় তোর মনের জ্বালা কেউ দেখবে না। তোর এ পৃথিবীতে আপন বলে কউই নেই। তুই এত মুখের খোটা শুনে বাঁচবি কি করে? এ জ্বালা কতদিন এভাবে সহ্য করবি? তার চাইতে তুই হয় এন্ড্রিন খেয়ে না হয় গলায় ফাঁস দিয়ে মর। বাস্ তখন শয়তানের এ পরামর্শ মুতাবিক যদি ফাঁক পায় তবে এক ফাঁকে আত্মহত্যা করে বসে। এভাবে কত মাতৃ জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে কয়জন তার হিসাব রাখে।

এ ছাড়াও যারা ভাল মানুষ; যারা স্ত্রীদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করেন তাদের বেলায়ও খোঁজ নিলে দেখা যায় যে রাসূলের শিক্ষায় তারা এখনও পৌছতে পারেনি। যেমন, যদি হিসাব নিয়ে দেখা যায় তা হ'লে দেখা যাবে একটু মাথা ধরলে যেখানে স্বামীর অনেক খেদমত করা লাগে অথচ ততটুকু মাথা ধরলে তার স্ত্রীর কিছুই প্রয়োজন হয় না। এভাবে হাতড়ালে অনেক কিছুই বের হবে, যা লিখতে গেলে মূল বক্তব্য থেকে সরে যাওয়ার মত মনে হবে, তাই এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি।

অধীনস্থদের অধিকার ঃ

"তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। নিজেরা যা খাবে তাদেরও তাই খাওয়াবে। নিজেরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরাবে।"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বড় লোকদের জন্য এক শক্ত নির্দেশ জারী করা হল। নিজে যা খাবে তাই তাদেরকেও অর্থাৎ দাসদাসী কিংবা এযুগে যারা কাজের লোক হিসাবে বাড়ীর কাজ কাম করে তাদেরকেও খেতে দেয়া এবং নিজেরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দেয়া একটুখানি কথা নয়। ঈদের বাজার করতে

www.pathagar.com

গেলে নিজের জন্যে যে কাপড় কিনি তা কি পারি কাজের ছেলের জন্যে কিনতে? নিজের স্ত্রীর জন্যে যে শাড়ী কিনি সেই দামে কাজের মেয়ের জন্যে পারি কি একখানা শাড়ী কিনতে? অথচ এইটাই আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ। যদি তা পারতাম তাহলে এই সমাজটাই গড়ে উঠত একটা বেহেশতি সমাজ হিসাবে। এখানে লক্ষণীয় যে অধীনস্থদের অধীনস্থ বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু চাকর বা চাকরাণী বলা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাই নির্মূল করা হয়েছে যে তারা তোমাদের অধীন হলেও নেহায়েত তুচ্ছ ও অপাংক্তের নয়। তোমাদের ছেলেমেয়েরা তোমাদের যেমন অধীন তেমন কাজের ছেলে মেয়েরাও তোমাদের অধীন। তারা তোমাদের নিছক চাকর চাকরাণী নয় বরং তারা তোমাদের সাহায্যকারী।

দুনিয়ার প্রত্যেক মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই ঃ

"হে লোক সকল। তোমরা শুনে রাখ মুসলিমরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই। সাবধান তোমরা আমার পরে একজন আরেকজনকে হত্যা করার মত কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ো না।"

আফসোস যে হুজুর (স) কে আমাদের রাসূল বলে মেনে নেয়ার পরও তাঁর এই নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হচ্ছি। যদি এই একটি মাত্র নির্দেশ গোটা পৃথিবীর মানুষ মেনে নিত তাহ'লে কি আজ মুসলমানে মুসলমানে কোন আত্মঘাতী কোন্দল ও খুনাখুনি হতে পারত ? অবশ্যই তা হতে পারত না।

আল্লাহ প্রত্যেকেরই অধিকার দিয়েছেন

"হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের হক বা অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারীর জন্যে আর কোন অসিয়ত কার্যকর হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ কোন মৃতব্যক্তি যে সব ধন সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসের মধ্যে ভাগ করার বেলায় এটা দেখতে হবে যে যারা ওয়ারিস আছে তাদের কাউকে অতিরিক্ত দেয়ার জন্যে ঐ মৃত ব্যক্তির কোন অসিয়ত আছে কি নেই।

www.pathagar.com

যদি এমন হয় যে কয়েকটি ছেলেমেয়ের মধ্যে ১টিকে কিছু বেশী দেয়ার জন্যে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে গেছেন সেখানে যেহেতু ছেলে মেয়েরা কে কত পাবে তা আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন কাজেই এই হিসাব কমবেশী করার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। তবে যাদের হক আল্লাহ নির্ধারিত না করে বরং দাদা নানার উপর ছেড়ে দিয়েছেন তাদের ব্যাপারে যা অসিয়ত থাকবে এবং যদি মৃতব্যক্তির কোন ঋণ থাকে তাহলে সেই ঋণ ও অসিয়ত আদায় করে দেয়ার পর যা থাকে তাই অন্যেরা বন্টন করে নেবে। কিন্তু যাদের হক আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন তাদের জন্যে আর কোন অসিয়ত চলবে না।

সন্তানের পরিচয়

"সন্তানের জন্য শর্ত হল তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই। আর সবার হিসাব নিকাশ আল্লাহর উপর ন্যাস্ত।

যে ব্যক্তি নিজের পিতার স্থলে অপরকে পিতা বলে পরিচয় দেয় ; নিজের অভিভাবককে ছেড়ে দিয়ে অপরকে অভিভাবক বা মওলা হিসাবে গ্রহণ করে ও পরিচয় দেয় তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত।"

আমানত ও ঋণ আদায় করতে হবে

ঋণ আবশ্যই আদায় করতে হবে এবং আমানত তার মালিককে ফেরত দিতে হবে।" কোন ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোদের জন্যে কেউ যামিন হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (স) তার জানাযা পড়েননি। কাজেই আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেন ঋণ এবং আমানত যথা স্থানে বা হকদারের হাতে পৌছে দিতে পারি।

সম্পদের অধিকার

"কারও কোন সম্পদ বা কোন সম্পত্তি যদি তার মালিক স্বেচ্ছায় কাউকে না দেয় তাহলে তা অপরের জন্য হালাল হবে না। সুতরাং তোমরা কেউ কারও উপর জুলুম করো না। কোন স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সম্পত্তির কোন কিছু তার বিনা অনুমতিতে কাউকে দেয়া হালাল নয়।"

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। যথা – কোন সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক যদি নিজ ইচ্ছায় কাউকে তা না দেয় তবে তা অন্যের জন্যে হালাল নয়। বিশেষ করে আমরা একটা ক্ষেত্রে দেখে থাকি এই নির্দেশ প্রতিপালিত হয় না। সেটা হচ্ছে বোনের অংশ ভাইয়েরা দিতে চায় না। পিতার মৃত্যুর পর ভাই বোনদের মধ্যে ফারায়েজ মুতাবিক যে যা পায় তা তাকে দিয়ে দেয়া উচিৎ। এর পর যদি কোন বোন আপন ইচ্ছায় তার সম্পত্তি তার ভাইদের ভোগ দখল করতে দেয় তবে তা হারাম হবে না। আর দ্বিতীয় আরেকটা ক্ষেত্র রয়েছে তাহল স্বামীর কোন জিনিস তার বিনা অনুমতিতে কাউকে দেয়া। এ দেয়াটা দান খয়রাতও হতে পারে কিংবা তার আত্মীয়-স্বজন পিতা মাতা কিংবা ভাই বোনদেরকেও দেয়া হতে পারে । স্বামীর সব কিছুই তার স্ত্রী হেফাজত করে থাকেন। কাজেই এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ তার স্ত্রী অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে। এইটা যেন কোন মহিলা না করে সে বিষয়েও রাসূলে করিম (স) বলতে ভুল করেননি।

আমীরের অধিকার

"যে কোন নাক কান কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের আমীর বানিয়ে দেয়া যায়। তবে যতদিন পর্যন্ত তিনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবেন ততদিন অবশ্যই তার কথা শুনবে। তার নির্দেশ মানবে ও তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে লক্ষনীয় যে যারা সংগঠিত নয়, তাদের জন্য আমীরের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং মুসলমান যে অসংগঠিত থাকতে পারে না হুজুরে পাক (স) এর গোটা জীবনকে সামনে রেখে দেখলে সহজেই প্রমাণিত হয়। তাই একথা বলা হল না যে তোমরা জামায়াতবদ্ধ অবস্থায় থাকবে। বরং বলা হয়েছে আমীরের আনুগত্য করবে। তার অর্থ হল যে অবস্থায় আমীরের প্রয়োজন সেই অবস্থা থেকে অর্থাৎ জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করা থেকে তোমরা মুক্ত নও। যারা জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করে না তাদেরকে যে কোন মুহূর্তে শয়তান বিপথগামী করতে পারে। এই জন্যে আমাদের জামায়াতী জীবন যাপন করতে

www.pathagar.com

হবে এবং জামায়াতের যখন যিনি আমীর থাকেন তখন তার আনুগত্য করতে হবে। এতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রুরা সর্বদাই কাবু থাকবে। আর যখনই আমীরের আনুগত্য থাকবে না তখনই সংগঠন দুর্বল হবে এবং তখনই সংগঠন তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে।

দেশ রক্ষার জন্য যেমন সামরিক বাহিনী নামে একটা বাহিনী রয়েছে এবং এ বাহিনী যেমন কমাণ্ডারের নির্দেশ না মানলে দেশ রক্ষার জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই ইসলামকে ইসলামের সঠিক স্থানে রাখার জন্যে প্রয়োজন বৃহত্তর ইসলামী জামায়াত। আর সে জামায়াতের জন্যে প্রয়োজন একজন আমীর। সে আমীর যে কোন বংশেরই হোক না কেন হতে পারে তবে শর্ত হচ্ছে এই যে কুরআন হাদীস জানা লোক হতে হবে। কারণ হুজুর (স) বলেছেন যতদিন সে আমীর কুরআন হাদীস মুতাবিক চালাবে ততদিন তার হুকুম মানবে যেন আমীরের হুকুম মানলে ইসলামের বিধানই পালন করা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, কুরআন হাদীস মুতাবিক চালানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। কুরআন হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা যদি থাকে তাহলে তিনি কুরআন হাদীস মুতাবিক চালাতে ব্যর্থ হবেন। এজন্যে যে কোন ইসলামী সংগঠনের আমীরকে এবং তার পরামর্শ পরিষদকে আলেম হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু আলেমই নয় বরং তাঁকে খুব বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হবে। যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে ভুল না করে ফেলেন।

ইসলামের রুকনসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে ঃ

"শোন, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। রমজান মাসে রোযা রাখবে। খুশী মনে যাকাত আদায় করবে। রবের ঘর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করবে। আর আমীরের এতায়াত করবে তাহলেই তোমরা বেহেশতে দাখিল হতে পারবে।"

খতমে নবুওয়াত ঃ

"হে লোক সকল! আমার পর আর কোন নবী নাই এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মাত নাই।"

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণের এ অংশ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হল যে, রাসূলের(স) পরে আর কেউই নবুয়তির দাবী করলে তা হবে মিথ্যা বাভুয়াদাবী এবং তার এই ভুয়া দাবী কেউ মেনে নিলে সে আর মুসলমান থাকতে পারে না। অর্থাৎ মূল আকীদার মধ্যে কোন ঘাটতি ঢুকলে এবং সে ঘাটতি যদি ইসলামের মূল আকীদার পরিপন্থী হয় তাহ'লে তাদেরকে আমরা মুসলমান হিসাবে মেনে নিতে পারি না।

সামগ্রিক পথ নির্দেশ ঃ

"আমি তোমাদের নিকট দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি তাহল আল্লাহর কুরআন এবং আমার সুন্নাত । যতদিন তোমরা এ দুটোকে আকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা গোমরাহ হবে না।"

ব্যাখ্যাঃ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আজ আমাদের মধ্যে যারা বোজর্গানে দ্বীন হিসাবে পরিচিত তাদের একটা শ্রেণী আল্লাহর কুরআনকে অতি সুকৌশলে এড়িয়ে চলছেন। তাঁরা বলেন কুরআন বুঝার মত জ্ঞান আমাদের নেই কাজেই কুরআন বুঝতে গেলে ভুল করে বসতে পারি। এইটাই হচ্ছে একটা বিভ্রান্তিকর কথা। কারণ আল্লাহ তো কুরআন মানুষের বুঝার জন্যেই নাযিল করেছেন এবং আল্লাহ নিজেই বলেছেন এটাকে খুব সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন যেন সবাই বুঝতে পারে। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ القمر - ١٧

আমি এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। ইহা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে কেউ প্রস্তুত আছে কি? অর্থাৎ নিজেই সেখানে বলছেন যে ইসলামের পথে চলার জন্যে এটাকে (আল কুরআনকে) সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। সেখানে আমরা কি করে বলতে পারি যে এটা বুঝার মত জ্ঞান আমাদের নেই। বরং যাদেরই নিরপেক্ষ জ্ঞান রয়েছে তাদেরই জ্ঞানে এটা ধরা পড়বে যে কুরআন বুঝার জন্যেই নাযিল করা হয়েছে।

কুরআন বুঝা কেমন জরুরী তা একটা উদাহরণ সহ বুঝানোর চেষ্টা করছি। মনে করুন আপনার নিকট প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষ থেকে একখানা

www.pathagar.com

নোটিস আসল। নোটিসটা লেখা ইংরেজীতে। আপনি ইংরেজী জানেন না। তখন কি আপনি মনে করবেন যে আমি যেহেতু ইংরেজী জানিনা কাজেই নোটিসে কি লেখা আছে না আছে তা আমার দেখে দরকার নেই। নাকি মনে করবেন যে নোটিসে কি লেখা আছে তা আমাকে অবশ্যই জানতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই এই নোটিস নিয়ে ইংরেজী জানা লোকদের নিকট ছুটাছুটি করবেন এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্রই জেনে নিবেন যে কি নোটিস জারী করা হল। মনে করুন নোটিসে লেখা আছে অমুক তারিখের মধ্যে যদি তোমার খাজনা পরিশোধ না কর তাহলে তোমার ঘর বাড়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তখন আপনি কি করবেন? আপনি অবশ্যই আপনার ঘর বাড়ী উদ্ধার করার জন্যে যেভাবে পারেন খাজনা পরিশোধের চেষ্টা করবেন। সাধারণতঃ এইটাই মানুষ করে থাকে।

এবার চিন্তা করুন সব সরকারের উপরের সরকার খোদ আল্লাহর নিকট থেকে কোন নোটিস আসলে তা-কি বুঝতে হবে না? আরবী লেখা আছে– যা আমার মাতৃভাষা নয়– এই অজুহাতে ফেলে রাখা চলবে? যদি আল্লাহর নোটিসে এইরূপ লেখা থাকে যে অমুক তারিখ পর্যন্ত এইসব কাজগুলি যদি না কর তাহলে তোমার বেহেশতের ঘর বাড়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে তা হলে বেহেশতের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্যে সে কাজ কি আপনাকে আমাকে করা লাগবে না?

এখানে লক্ষণীয় যে নোটিসের ভাষা জানা কি আমার জন্যে জরুরী নাকি নোটিসে যা নির্দেশ আছে তা বুঝা এবং তার উপর আমল করা জরুরী? এর জবাবে যে কোন কম বুদ্ধির লোকও বলবে যে নোটিসের ভাষা জানা জরুরী নয়, তবে তার মধ্যে কি নির্দেশ রয়েছে তা নোটিসের ভাষা জানা লোকদের নিকট থেকে বুঝে নিতে হবে এবং সেই মুতাবিক আমল করতে হবে। এইটাই যুক্তি।

অথচ আমাদের সমাজে কিছু লোকের মধ্যে এমন একটা গোঁড়ামি ঢুকে গেছে যে যতই ভাল কথা হোক না কেন তার কিছুই মানবো না যদি আমার হুজুর কেবলা বা আমার মুরব্বি মানতে না বলেন। এটা তিক্ত হলেও সত্য। তাই যে সত্য আমার চোখে ধরা পড়েছে তা আল্লাহর ওয়াস্তে অকপটে ব্যক্ত করেছি।

আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের তৌফিক দাও যেন তোমার কথাকে গুরুত্ব সহকারে বুঝতে এবং সেই মুতাবিক জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত হতে পারি।

www.pathagar.com

আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে ট্রানজিষ্টারের মিটার সামান্য একটু ঘুরিয়ে দিলে যেমন এক জায়গার কথা বন্ধ হয়ে অপর জায়গার কথা আসা শুরু হয়ে যায় ঠিক তেমনই ইসলামের মূল শিক্ষা যা আল কুরআনে রয়েছে যা খোদ আল্লাহর কথা তা বাদ দিয়ে চলতে গেলে আশংকা রয়েছে মূল রাস্তা বা সিরাতুল মুস্তাকীম ছেড়ে শয়তানের পথে চলে যাওয়ার। এই কারণেই মূল কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন নির্ধারিত সিলেবাসে ইসলামের সঠিক বুঝ আসবে না।

এছাড়া আমরা আরও একটা উদাহরণ থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারি। যেমন ধরুন কা'বা শরীফ রয়েছে ২২ ডিগ্রি অক্ষাংশে। আমরা এখান থেকে প্লেনে উঠে যদি সুনির্দিষ্ট কোণ করে না গিয়ে একটু খানি তির্যক ভাবে প্লেন চালাই তাহলে যতদূরে যাব ততই কাবার পথের সঙ্গে আমাদের চলার পথের ব্যবধান বাড়বে এবং মক্কার পাশ কেটে ভুল পথে চলে যাব। ঠিক তেমনই যতই আল কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাতকে পাশ কেটে চলি ততই সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে আমরা দূরে সরে যাব। সঠিক পথ আর খুঁজে পাব না।

দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই

"খবরদার, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। জেনে রেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।"

ব্যাখ্যাঃ এখানে লক্ষণীয় যে দ্বীনের ব্যাপারে এখলাসের সঙ্গেই অনেকে অনেক প্রকার চিন্তা ভাবনা করেন কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের চাইতে যে আমরা বেশী বুঝি না এই বুঝটা আমাদের মধ্যে থাকা উচিৎ। অনেক সময় দেখা যায় দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের চাইতে আমরা বেশী বুঝার দাবী করে বসি। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এ নিয়মটা কোথা থেকে পেয়েছেন তার জবাবে বলা হয় মুরব্বিদের নিকট থেকে পেয়েছি। কিন্তু বলা উচিৎ ছিল এটা কুরআন হাদীস থেকে পেয়েছি। বড়জোর এতটুকু বলা চলে যে এটা আমার হুজুর আমাকে কুরআন থেকে এবং রাসূলের হাদীস থেকে শুনিয়েছেন।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে একটা ঘটনার দিকে লক্ষ্য করতে পারি। তা হচ্ছে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনা। সন্ধির শর্তগুলি যা খোদ আল্লাহর রাসূল মেনে নিলেন তা জলিলুল কদর সাহাবীগণ মানতে আপত্তি জানালেন।

এখানে সাহাবীদের মধ্যে এখলাসের কি কমতি ছিল? তারা দ্বীনেরই মুহাব্বতে চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের চিন্তা যে, সঠিক ছিল না তা বুঝা গেল তাদের মধ্যে রাসূল (স) স্বয়ং ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর উপর ওহি নাযিল হওয়ার কারণে। আল্লাহ ওহি নাযিল করে বললেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ الْحُجُرٰتِ - ١

ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আগে আগবেড়ে যেওনা। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

এটা নাযিল হয় হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে আল্লাহ স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন যে দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রাসূলের চাইতে আগ বেড়ে বেশী বুঝতে যাওয়া ঠিক নয়। আমাদের ইসলাম পালন হতে হবে সম্পূর্ণভাবে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক, কোন অনবীর তরীকা বা পন্থা ভিত্তিক নয়। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে পূর্বেকার জাতিসমূহের ন্যায় ধ্বংসের পথ অবলম্বন করা হবে।

সাবধান

"এই ভূমিতে আবার শয়তানের পুজা হবে এ ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে তবে ছোট খাট ব্যাপারে তোমরা তার (শয়তানের) অনুসারী হয়ে পড়বে। এতে শয়তান খুশী হবে। অতএব তোমরা সাবধান থেকো যেন দ্বীনের ব্যাপারে শয়তান তোমাদেরকে বিপথগামী না করে।"

ব্যাখ্যাঃ হুজুরে পাক (স) মক্কা মদিনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ ভূমিতে আর শয়তানের পূজা হবে না। শয়তানের পূজা ঠিকই হচ্ছে না। বিশেষ

www.pathagar.com

করে মুসলমানদের মধ্যে শেরেকীর সূত্রপাত হয় কবর পূজার পথ ধরে। এ ব্যাপারে মক্কা মদিনা খুবই হুঁশিয়ার। ভক্ত মুসলমানরা হুজুরের (স) কবরের নিকটেও যেন না ঘেঁষতে পারে সে ব্যবস্থা সেখানে আছে। ইসলামী দন্ডবিধিও সেখানে চালু আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পুলিশ এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ মুনিবের ভূমিকায় রয়েছেন কিন্তু আরব ভূমিতে তারা সত্যিকার অর্থে খাদেমের ভূমিকায় রয়েছেন। এতদসত্বেও কিছু কিছু ব্যাপারে মনে হয় যেন রাসূলে করিম (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকই কার্যকর হচ্ছে। যেমন "আল-বোগজো ফিল্লাহ ওয়াল হোব্বু ফিল্লাহ" এর ব্যাপারে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু গরমিল হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখার মত সময় এসেছে বলে মনে হয়। আরও ভেবে দেখা উচিৎ যে বহিরাগত হাজীদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে আরও সজাগ দৃষ্টির ও নমনীয় মনোভাবের প্রয়োজন আছে কিনা এবং রাসূলের (স) কওল অনুযায়ী শয়তান খুশী হওয়ার মত কোন ব্যাপার ঘটে যায় কিনা।

এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য শুধু এতটুকু যে, হুজুরে পাক (স) যে ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলেছেন সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে কি না তা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ মাত্র।

আমরা হুজুরে পাক (স) এর দেশের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখি। সে দেশের লোকদেরকে আমরা আপন ভাইয়ের মত মনে করি। সেই আরব ভূমির যে কোন লোক দেখলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে কিন্তু এসব কিছুর উপরে হুজুরে পাক (স) এর বাণীর গুরুত্ব আমাদের নিকট অনেক অনেক গুণ বেশী।

তাবলীগের দায়িত্ব

"শোন, তোমরা আজ যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা এই পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দেবে যারা আজ এখানে নেই। অনেক সময় দেখা যায় যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছান হয় পৌঁছানেওয়ালার চাইতে তিনি বেশী সংরক্ষণকারী হয়ে পড়েন।"

ব্যাখ্যা ঃ যিনি ইসলামের দাওয়াত পান এবং দাওয়াত পেয়ে বহুত শুকরিয়া আদায় করেন যে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমি ইসলামের

www.pathagar.com

দাওয়াত পেয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই চিন্তা করেন যে আমি যেমন দাওয়াত পেয়েছি তেমন অন্যদের নিকটও দাওয়াত পৌঁছান দরকার।

এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করা উচিত যে হজরত আদম (আ) থেকে এ পর্যন্ত লোকদের হেদায়েত করার জন্যে বহু নবী রাসূল আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন মানুষ ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে অর্থাৎ দোজখের পথ ত্যাগ করে যেন বেহেশতের পথ ধরতে পারে। কিন্তু নবী রাসূল আগমনের পথ যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন মানুষের হেদায়েতের পথও কি বন্ধ হবে?

আমরা যখন নির্ঘাত বুঝি যে, এড্রিন খেলে মানুষ মরবেই তখন তোমাদের সামনে কেউ যদি ভুল করে ঔষধ মনে করে বাঁচার লোভে এড্রিন পান করে আমরা কি তাকে এড্রিন পান করা থেকে ফিরাই না? নিশ্চয় ফিরাই। এটা যখন আমরা করি এবং এ কাজকে যখন আমরা একটা বড় রকমের নৈতিক দায়িত্ব মনে করে পালন করি তখন আমরা পরকালের ঘটনাবলীকে বিশেষকরে দোজখের ব্যাপারটাকে যদি দেখা বিশ্বাসের মত বিশ্বাস করতে পারি তাহ'লে কি করে বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে হেদায়েত না করে পারি? আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে রাসূল (স) এর পরে আর কোন নবী রাসূল হেদায়েতের জন্যে আসবেন না। অতএব, এই হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদেরকেই। আমাদের যার নিকট যতটুকু হেদায়েত রয়েছে তার কাছ থেকে ততটুকুর হিসাব নেয়া হবে পরকালে। এর একটা উদাহরণ এ ভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ধরে নিন, কোন এলাকায় বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধি দেখা দিয়েছে। সেই এলাকায় সরকার বা কোন সংস্থা কতকগুলি চিকিৎসক টিম পাঠাল এবং এক একটা টিমকে এক একটা এলাকা ঠিক করে দেয়া হল। ধরুন কোন এলাকার চিকিৎসক টিমের নিকট কলেরা চিকিৎসার জন্যে কিছু ক্যাপসুল আছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনে স্যালাইন দরকার হলে তা দিতে পারবেনা কারণ ঐ টিমের নিকট স্যালাইন নেই। এই টিমের এলাকায় কোন রোগী যদি স্যালাইনের অভাবে মারা যায় তবে ঐ টিমকে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ তাদের নিকট স্যালাইন ছিলনা। যে টিমের নিকট স্যালাইন পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে তাদের এলাকায় কেউ

www.pathagar.com

যদি টিমের চিকিৎসকদের অবহেলার কারণে কলেরায় মারা যায় তবে যে মরল সে তো মরলই কিন্তু যাদের অবহেলার কারণে মরল তাদেরকে ছাড়া হবে না। তাদেরকে অবশ্যই কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। ঠিক তেমনই পরকালের আযাব থেকে উদ্ধার করার মত হেদায়েতের উপাদান যার নিকট যতটুকু রয়েছে তিনি যদি ততটুকু ঠিক মত প্রয়োগ না করেন তবে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্যে স্পষ্ট করে বলা যায় যিনি ইসলাম সম্পর্কে যত বেশী জ্ঞান রাখেন এবং ঈমান যার যত মজবুত তাবলীগের দায়িত্ব তার ততবেশী। এ ব্যাপারে আরও একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন মনে করুন, আপনি একজনকে একশত টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালেন কিছু বাজার করতে। আর একজনকে দশ হাজার টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালেন কিছু কিনতে। তারা দুইজনই বাজার করে ফিরে আসল। আপনি যাকে একশত টাকা দিয়েছিলেন তার নিকট থেকে একশত টাকারই হিসাব নিবেন। তাকে কখনও বলবেন না যে তুমি একশত এক টাকার হিসাব দাও। আর যাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন তার নিকট থেকে দশ হাজার টাকারই হিসাব নিবেন। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ যাকে যতটুকু ইসলামী জ্ঞান ও ইল্‌ম্ দান করেছেন পরকালে তার নিকট থেকে ততটুকুরই হিসাব নিবেন যে তুমি তোমার জ্ঞান ও ইল্‌ম্ মুতাবিক কতটুকু তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছ? এ কারণেই আমাদের সমাজের যার মধ্যে যতটুকু দ্বীনি সমুঝ বুঝ আছে তার সেই পরিমাণ তাবলীগের দায়িত্ব নেয়া উচিৎ। কিন্তু রাসূলের তাবলীগ আর বর্তমান যুগের তাবলীগের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও গরমিলই যেন বেশী।

যেমন রাসূলের তাবলীগের সামনে জিহাদ ছিল এবং হিজরাত ছিল। বর্তমান বহুল পরিচিত তাবলীগের জিহাদ নেই হিজরাতও নেই। রাসূলের (স) তাবলীগের সামনে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল কিন্তু আজকার তাবলীগের সামনে বাতিলের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম নেই। রাসূলের তাবলীগে আসল হরকাত ছিল আর বর্তমান তাবলীগে রয়েছে নকল হরকাত। এ সব দেখে মনে সন্দেহ লাগে যে এটা কি রাসূল (স) নির্দেশিত সেই তাবলীগ?

আমরা বুঝি যে বাংলাদেশ ব্যাংক যে নোট ছাড়ে ওটা আসল টাকা। আর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ছাড়া নোটের সঙ্গে যে নোটের অতি সামান্যতমও

www.pathagar.com

গরমিল দেখা যায় সে নোটকে আমরা জাল নোট হিসাবে পরিত্যাগ করি। তা কখনও খাঁটি বা চল নোট হিসাবে গ্রহণ করি না। ঠিক তেমনই ভাবে রাসূল (স) এর দেয়া ইসলামই হল প্রকৃতপক্ষে আসল ইসলাম। আর সেই ইসলামের সঙ্গে যদি এ যুগের কারো উত্থাপিত ইসলামের মিল না পাওয়া যায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে যদি গরমিল পাওয়া যায় তবে কি ভাবে গ্রহণ করব এটা ভাববার বিষয়।

এ ছাড়া আরও একটা বিষয় ভেবে দেখা উচিৎ যে রাসূলের তাবলীগ ছিল অমুসলিমদের মধ্যে আর আমরা তাবলীগ করি কাদের মধ্যে?

রাসূলের তাবলীগে যেখানে ২৩ বছরের মধ্যে ১৩ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার লক্ষ লক্ষ বনি আদম দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলেন আর তার মুকাবেলায় আমাদের তাবলীগের ফলাফল আমরা কি পাচ্ছি। আমরা পাচ্ছি এই যে দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে এ দেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার। ১৯৭৪ সালে এ সংখ্যা হল ২ লক্ষ ১৬ হাজার। আর বর্তমানে ৮৭ তে তাদের সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। বিভিন্ন এলাকার বহু মুসলিম পল্লী আজ খৃষ্টান পল্লীতে পরিণত হচ্ছে। এসব হিসাব কি আমরা কখনও খতিয়ে দেখেছি। তারা যেভাবে তাদের (খৃষ্টানদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে তাতে আর এক হাজার বছর পর এদেশ কি মুসলমানদের দেশ থাকবে নাকি খৃষ্টান দেশে পরিণত হবে তা কখনও চিন্তা করে থাকি? রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে তার ইঙ্গিত দিতে ভুল করেননি।

সূরা নসরের পর আর পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি। এই সূরাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স) এর মহাপ্রস্থানের সংকেত যা স্বয়ং রাসূল বুঝতে পেরে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর দূরদর্শী সাহাবীগণও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বুঝে শুনেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ পেশ করেন। ইহাই ছিল সর্বশেষ শরীয়ত প্রবর্তকের শেষ ও চূড়ান্ত দিক নির্দেশনা। হুজুরের তিরোধানের অব্যবহিত পরের চার খলিফার শাসনামলে শাসন ও শাসিতগণ বিদায় হজ্জের ভাষণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ইসলামকে স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করাতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

আরবের মরুর বুকে বিস্ফোরিত ইসলামের তেজস্ক্রিয়তা এক শতাব্দীর মধ্যেই পৌঁছেছিল পৃথিবীর আনাচে কানাচে। যার প্রবাহ এখনও বহমান। মন্থর হলেও গতি অব্যহত। আজ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ মুসলিম। দুনিয়ার এমন কোন জনপদ নেই যেখানে মুসলিম নেই।

এখনও সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামে শামিল হচ্ছে। ইসলামের কতিপয় আকর্ষণীয় দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তারা ইসলামে শামিল হচ্ছে। বিজয়ী শক্তি হিসাবে ইসলামের যে মহান রূপ তা তারা দেখেনি। আজকের মুসলমান তা দেখাতেও পারছে না। রাসূলুল্লাহর বিদায়ী ভাষণের উপর মুসলিম জাতি আজও যদি আবার পুরোপুরি আমল করে তবে এ বিংশ শতাব্দীর সচেতন মানুষ কেউ গোমরাহীতে ডুবে থাকবেনা। নিসন্দেহে সারা পৃথিবী ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডার নীচে এসে যাবে। স্বার্থপরতা অমানবিকতা হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে। সারাটা পৃথিবীই শান্তি ও সমৃদ্ধির এক বেহেশ্‌তে পরিণত হবে।

আসুন, রাসূলুল্লাহর বিদায়ী ভাষণকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করি। প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে, তারপর সমাজ জীবনে, তারপর জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করি। আল্লাহর এ ধরণীকে বেহেশ্‌তে পরিণত করি।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫২. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহমেদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫